

ହମାଯୁନ ଆଜାଦ

ଯାଦୁକରେର ମୃତ୍ୟ



যাদুকরের মৃত্যু

গত দেড় দশকেরও বেশি সময়ে হমায়ুন আজাদ লিখেছেন পাঁচটি বিশ্বাকরণ গল্প ‘অনবরত তুষারপাত’ ‘মহান শয়তান’, ‘যাদুকরের মৃত্যু’ ‘জঙ্গল, অথবা লাখ লাখ ছুরিকা’, এবং ‘আমার কুকুরগুলো’।

এ-গৃহে সংকলিত হয়েছে সে- গল্পগুলো। হমায়ুন আজাদ স্থুল বাস্তবতা বা দুষ্ট সুখদুঃখের গল্প বলেন নি; তিনি চেয়েছেন শির সৃষ্টি করতে। তাঁর গল্প প্রতীকী, ঝুঁক আর চিত্রকর্মচিত, জীবনের গদ্য ও কবিতায় মিশ্রিত, যা এখানে আগে আর হয় নি। যেমন, ‘যাদুকরের মৃত্যু’—এক অসামান্য গল্প, যাতে পাওয়া যাবে দুর্গত বাঙ্গালাদেশকে; কেউ কেউ খুঁজে পেতে পারেন এক মহাযাদুকরকে, কিন্তু এ-গল্প ফোভের নয়, বিদ্রোহের নয়, এ-গল্প জীবনের থেকে যা মহৎ, সে শিরকলার। হমায়ুন আজাদের গল্পের পেছনে রয়েছে বাস্তব, কিন্তু তিনি তাকে ঝুঁকাত্তরিত ক'রে দিয়েছেন বাস্তবের থেকে মূল্যবান

শিরকলায়।

ভূমায়ন আজাদ

যাদুকরের

মৃত্যু

www.boighar.com

ହମାୟୁନ ଆଜାଦ

www.boighar.com

ଯାତ୍ରକରେଳ

www.boighar.com

ମୃତ୍ୟ



ଆଗାମୀ ପ୍ରକାଶନୀ

www.boighar.com

www.boighar.com
প্রথম প্রকাশ

ফালুন ১৪০২ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

শহুর হমায়ুন আজাদ

প্রকাশক সেমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার

ঢাকা ১১০০ ফোন ২৩১৩৩২

প্রচদ সমর মজুমদার

মুদ্রণ স্বরবর্গ প্রিন্টার্স ২৭ বি কে দাস রোড ঢাকা

মূল্য : চাল্লিশ টাকা

ISBN 984-401-327-5

Yadukarer Mrityu Death of the Magician

A Collection of Short Stories by Humayun Azad.

Published by Osman Gani, Agami Prakashani, 36 Banglabazar,
Dhaka 1100, Bangladesh. First Published February 1996.

Price Tk 40.00
www.boighar.com

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

दरे



SCANNED

EDITED

દરે

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ
জোবেদা খাতুন
আমার মা
www.boighar.com

যাদুকরের

মৃত্য

www.boighar.com

জাদুকরের মৃত্যু

ভ্রায়ন আজাদ

কৃতিজ্ঞতা

TUHOON

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর>

IF YOU LIKE THIS BOOK

Please buy the original book and help writer &
publisher

গ ঋ স মৃ হ

অনবরত তুষারপাত ১১

মহান শয়তান ২০

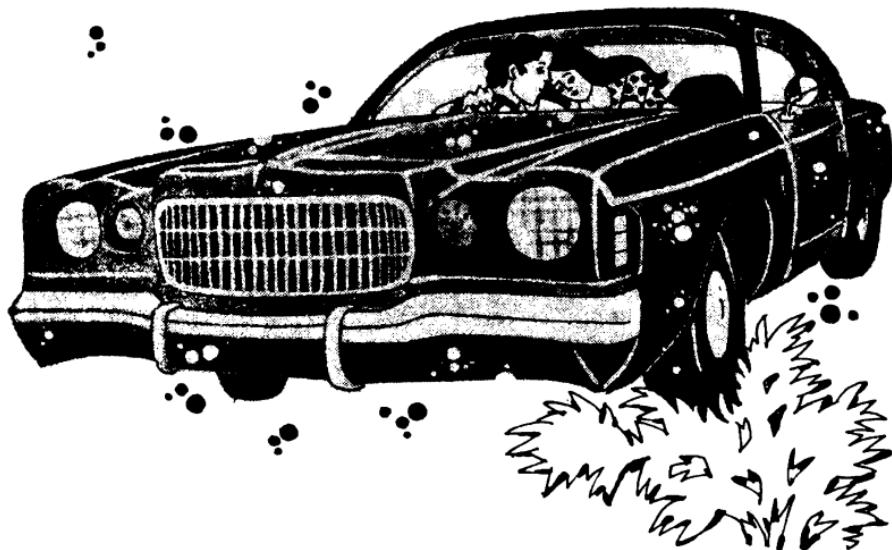
যাদুকরের মৃত্যু ৩২

জঙ্গল, অথবা লাখ লাখ ছুরিকা ৪৩

আমার কুকুরগুলো ৫০
www.boighar.com

অনবরত তুষারপাত

www.boighar.com



সচিত্করণ কাইয়ুম চৌধুরী

রেহমান ও হাসিনার বিয়ে হয়েছে গত পরশ, রোববার, ওদের পরিচয়ের
বছরখানেক পর;—আজ ওরা, পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে, মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছে দেশের
সবচেয়ে মধুভরা অঞ্চল মধুবাজারে, যেখানে গাছপালাআকাশ জলতরঙ্গের মতো

বাজে, সমুদ্র দোলে বিশাল পারদপাত্রের মতো। রেহমানের একটা লাল, প্রায়-ডানাঅলা গাড়ি আছে। হাসিনাৰ স্বপ্নপরিকল্পনা ছিলো ‘মধুচন্দ্রিমায় যাবো আমরা—মধুব’জারে—তুমি গাড়ি চালাবে, আমি বাঁ পাশে ব’সে থাকবো। আমাদেৱ যাওয়া—যাওয়া—যাওয়া একটি লম্বা চুমোৰ মতো দীৰ্ঘতম মিলনেৰ মতো অজস্র পুলকেৰ মতো মনে হবে।’ গাড়িতে সব কিছু গুছিয়ে নেয়া হয়েছে; বেশ কটা স্যুটকেস উঠেছে—ভেতৱে সিঙ্কেৱ নৱম স্তূপ; পেছনেৰ সিটে বিৱাট স্থিৱ সূৰ্যাস্তেৰ মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে লাল গোলাপেৰ তোড়া। রেহমান গাড়িতে উঠে ষ্টিয়ারিংয়েৰ সাথে বুক লাগিয়ে বসেছে। হাসিনা এসে দৰোজা খুললো, উঠে রেহমানেৰ বাঁ পাশে বসলো; রেহমান গাড়ি ষ্টোৱ দিলো, আৱ অমনি ফালুনেৰ অষ্টম দিবসে, কৃষ্ণচূড়া-ৱাঙ্গ মঙ্গলবাৱে, গাড়িৰ উত্তৱ থেকে দক্ষিণ মেৰুণ পৰ্যন্ত একটা ঠাণ্ডা তুষারঝড় ব’য়ে গেলো। বাইৱে তখন চমৎকাৱ আলো, ৰৌদ্ৰ, উষ্ণতা, চিৱকালীন ফালুন; রাস্তাৰ পুব পাৱেৰ শাদা বাড়িটাৰ মাথা ডিঙিয়ে লাল মুখ দেখাচ্ছে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। কিন্তু গাড়িৰ ভেতৱে ধীৱে ধীৱে, কোন বিশ্বলোক থেকে যেনো, একটা ঠাণ্ডা কঠিন ধাৱালো প্ৰবাহ ব’য়ে যেতে লাগলো। গাড়ি ঢাকা শহৱ, শাদা বাড়ি, কৃষ্ণচূড়াৰ লাল মুখ ছেড়ে দশ মাইল এগিয়ে গেছে এৱ মধ্যে। ওৱা যেখানে যাবে, সে-মধুবাজাৰ ঢাকা থেকে তিনশো মাইল দূৱ; কিন্তু এদিকে ক্ৰমশ বেড়ে চলছে তুষারঝড়।

উভয়েৰ শৱীৱে, মসৃণ সিঙ্ক ও সিঙ্কেৱ থেকে মসৃণ তুক ভেদ ক’ৱে, শীত ও বৱফুচি চুকতে লাগলো।

‘আমাৱ শীত লাগছে, ভীষণ’, বললো হাসিনা, ‘বাইৱে কি তুষারঝড় বইছে?’

রেহমান, নিজ মাংসেৰ ভেতৱে জমাট তুষার খুচিয়ে খুচিয়ে বললো, ‘আমাৱও শীত লাগছে, খুব শীত লাগছে। বাইৱে তো বেশ ৱোদ, চিলেৱ ছায়াটিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; তুষার বইছে সন্তুষ্ট গাড়িতেই।’

‘গাড়িতে তুষার!’ চমকে উঠলো হাসিনা; একৱাশ তুষারকুচি ঝ’ৱে পড়লো তাৱ চুল আৱ ঠোঁট থেকে।

তবু তাৱ মনে হলো হয়তো কোনো অচিন্ত্য কাৱণে লাল গাড়িটিৰ ভেতৱে হিমালয়েৰ মতো বা হিমালয়েৰ থেকে আৱো বড়ো, একশো দুশো তিনশো হিমালয়েৰ সমান একটা পৰ্বত মাথা তুলছে, এবং তাৱ শাদা ধৰধাৰে শৱীৱ থেকে বাতাসেৰ চাপে তুষারঝড় ছুটে আসছে তাৱেৰ দিকে। হাসিনা গাড়িৰ পেছনেৰ দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো; দেখলো কোথাও কোনো পাহাড়পৰ্বত নেই, তুষার নেই, গাড়িৰ কাচ পেরিয়ে দূৱে শুধু একটা লাল রঙ-পৱা গাছ জুলছে। একটু স্বষ্টি লাগলো তাৱ; মনে তাপেৰ মতো চুকলো তাৱ একদা-প্ৰিয় একটা বোধ

‘আমার শরীরে মধু, রেহমান এক আশ্চর্য মৌমাছি, বস্তু থেকে সে কেবল মধু আহরণ করে। মধু উঠে আসে বস্তুর অভ্যন্তর থেকে তার মধু-অন্ধেষী দংশনে।’

ঠিক সে-মুহূর্তে রেহমান সুদূর মজ্জায় তুষার-কামড় বোধ করলো।

‘আমার যা শীত লাগছে, তাতে মধুবাজারে পৌছোতে পারবো তো?’ রেহমান জিজেস করলো।

হাসিনা রেহমানের দিকে তাকালো; হাত বাড়িয়ে তার শার্ট স্পর্শ করলো, হাত ছুঁলো, ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলো অনেকক্ষণ।

‘তোমার শার্ট, হাত, ঠোঁট, দাঁত সবই তো গরম, তবু কেনো ঠাণ্ডা লাগছে?’ বিশ্বিত হয়ে প্রশ্ন করলো হাসিনা।

রেহমান তার বাঁ হাতের তর্জনীটি হাসিনার ঠোঁটে ঘষলো; ব্লাউজের ভেতর দিয়ে শীতাত্ত সাপের মতো হাতটি চুকিয়ে স্তন স্পর্শ করলো, নাভি ছুঁয়ে দেখলো অনেকক্ষণ। হাসিনার শরীরের সর্বত্র গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণতা।

‘তুমিও তো উষ্ণ, তবু কেনো শীত লাগছে তোমার, হাসিনা?’ জিজেস করলো রেহমান।

এখন ওরা ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে; গাড়ি চলছে ঝকঝকে একটা রাস্তা দিয়ে; রাস্তার ডান দিকে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে; ছোটো ছোটো চেউয়ের টুপিতে, শাদা লাল হলদে পালের ফোলা বুকে, উদাম তরুণীর মতো শাঁ শাঁ ক'রে পানি-কেটে-যাওয়া একটা লক্ষ্মের পাছায় রোদ ঝলকাচ্ছে। দিকে দিকে রোদ; কিন্তু গাড়ির ভেতরে তুষারপাত, তুষারঝড় বেড়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। হাসিনা পেছনে তাকিয়ে দেখলো গাড়ির পেছনে সাজিয়ে রাখা বক্তলাল গোলাপগুচ্ছের একটির শরীরে বিন্দু বিন্দু তুষার জমছে। পেছনের সিটের ডান দিকে কাচ পেরিয়ে এসে এক টুকরো স্বচ্ছ রৌদ্র একটা আঁকাবাঁকা মানচিত্রের মতো প'ড়ে ছিলো। হাসিনা দেখলো রোদের বর্ডারের ওপর বিন্দু বিন্দু তুষার জ'মে উঠছে, রোদ্র-টুকরো ঘেরাও হয়ে গেছে তুষার-বর্ডারে। অবাক আর ভীত হলো হাসিনা। এতোক্ষণ যে-তুষার সে শুধু বোধ করছে অদৃশ্যতাবে, তা এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। শাদা তুষার ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে ফুলগুলোকে। রেহমানের গা ছুঁয়ে সে ডাকলো, এবং দেখালো গাড়ির পেছনের গোলাপগুচ্ছের গায়ে তুষার দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। হাসিনা আরো শীতল হলো;—একটু আগে সে একটি গোলাপের অর্ধাংশের পাপড়িতে শাদা ঠাণ্ডা তয়াবহ হিংস্র তুষার দেখেছে; কিন্তু এখন তুষার গোলাপটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে; ফুলটি একটি লাল বরফ-বলে পরিণত হয়েছে। অন্য একটি গোলাপেরও অভ্যন্তরে এবং পাপড়িতে জমাট বেঁধে উঠেছে সাংঘাতিক তুষার।

রেহমান গভীর তুষারলোক থেকে চিৎকার ক'রে উঠলো, ‘আমি কি তোমাকে ভালোবাসি, হাসিনা?’

হাসিনা তার প্রতিঘনি করলো, ‘আমি কি তোমাকে ভালোবাসি, রেহমান?’

কনকনে বাতাস বইছে গাড়ির ভেতরে, গুঁড়োগুঁড়ো তুষার ছড়িয়ে পড়ছে গাড়ির সর্বত্র। হাসিনা দেখলো বুটের ওপর তুষার পড়ছে, রেহমান দেখলো বনেটে তুষারস্তর গ'ড়ে উঠছে। ভূগোলে পড়া পাহাড়ের কথা মনে পড়লো রেহমানের; পাহাড়ের গঠনপ্রণালির কথা যা সে কোনোদিন মুখস্থ করতে পারে নি পরীক্ষার প্রয়োজনে, আজ তার নির্ভুল মনে পড়লো। একটা পাহাড় নাকি পর্বত, হয়তো হিমালয়ের সমান বা হিমালয়ের চেয়ে বড়ো তুষারমুকুট প'রে মাথা তুলছে ওপরের দিকে; হয়তো তার একটি উচ্চ চূড়ো আছে, কতো উচ্চ? রাধানাথ শিকদার কি তা বলতে পারবেন? তার নাম কি এভাবেষ্ট না রেহমান না হাসিনা? রেহমান/হাসিনা নামী শিখরের থেকে একটু দূরে, অনেক নিচে, সন্তুষ্ট দেখা যাচ্ছে গৌরীশংকর, বা কাঁ-ছেন-দজ্জাঁ-গা, কাঞ্চনজংঘা। চমৎকার নাম সব তুষারপরা শিখরগুলোর। একটু দূরে ধৰ্বধবে আগন্তের মতো শীতে জ্বলছে উপত্যকা, বিভীষিকা ছড়াচ্ছে অনাদি আদিম গিরিপথ, গ্রেসিয়ার। পাহাড়ের কাঁধে, পদতলে, গদিতে, চিমনিতে, মুখে, মালভূমিতে, মরেনে জমেছে ভয়াবহ তুষারপুঁজি। রেহমানের মাংস- ও স্পন্ধ-কোষে একটা তীব্র ঠাণ্ডা কামড় লাগলো। হাসিনার মাংসের ভেতর সামান্য উষ্ণতার মতো কী যেনো এলো। খড়কুটোর তরল আগন্তের উম্ভরা বাল্যস্থূতি সন্তুষ্ট, এ-অপরিসীম ঠাণ্ডায় হাসিনা তাকে পশ্চিম বেড়ালের মতো আঁকড়ে ধরলো। www.boighar.com

রেহমানকে, একটু তাপ দেবে ব'লে, ডেকে বললো, ‘ছেলেবেলায় আমি একটি ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম।’

‘আমিও ভালোবেসেছিলাম একটি মেয়েকে’ রেহমান বললো।

ওরা একটু চুপ ক'রে রক্তজমানো ঠাণ্ডায় খড়কুটোর তাপ উপভোগ করলো; মনোরম লাগলো উভয়ের। কোথাও কি তুষার গললো ভেতরে? তাপভরা পানি কি গড়িয়ে গড়িয়ে চললো কোনো নালিতে?

রেহমান বললো, ‘আমি যাকে ভালোবেসেছিলাম, তাকে আমি অন্যের সাথে ঘুমোতে দেখেছি।’

চমকালো হাসিনা, ‘অন্যের সাথে!’

সে খুব দুঃখ পেলো; রেহমান এতো ভালো অথচ কী দুঃখী!

‘আমার পাশের ঘরেই সে দিনের পর দিন অন্যের সাথে ঘুমিয়েছে’, বললো রেহমান, ‘আমি যেনো তাদের ঘুমোনোর শব্দ শুনতে পেতাম।’

হাসিনা বললো, ‘আমি ঘুমিয়েছিলাম তার সাথে, আমি ভালোবেসেছিলাম যাকে।’

‘তুমি খুব সুখী’ রেহমান মৃদু হাসলো, ‘সব সময়ই সুখী।’

রেহমান বাইরে তাকালো;—একটা চিল দু-ডানায় রোদ গেঁথে নিয়ে উঠেছে, ওর ডানা কোনো তুষারের সংবাদ জানে না; দূরে একটা লম্বা ইঙ্কুল ঘরের টেটিনের চালের ওপর জিভ চালাচ্ছে ক্ষুধার্ত রৌদ্র, তার জিভের নিচে কোনো তুষার জমতে পারে না; অথচ গাড়ির ড্যাশবোর্ডে জ'মে উঠেছে তুষারকুচি। এক্সিলিভেটর পাদানিতে চাপ দিতেই খচখচ ক'রে ভেঙে পড়লো হাঙ্কা তুষারের চাই;—রেহমানের মনে হলো তার পায়ের পাতা, তার আঙ্গুল, তুষারধূলো হয়ে ঝ'রে পড়েছে। স্পিডোমিটারের ওপর তুষারস্তর পড়েছে, বনেট শাদা হয়ে গেছে, স্টিয়ারিং হাইল পরিণত হয়েছে বরফচক্রে।

‘যে-রাতে ওরা প্রথম ঘুমোতে গেলো’ রেহমান বললো, ‘সে-রাতে আমি ঘুমোতে পারি নি। ওরাও ঘুমোয় নি। ওদের ঘর থেকে সারারাত শব্দ আসছিলো, পৃথিবীর ভয়াবহতম শব্দ।’

বিষণ্ণ চোখে রেহমানের দিকে তাকালো হাসিনা।

‘আমি বারবার, সারারাত, আজ্ঞামেখুন ক'রেও ঘুমোতে পারি নি’, বললো রেহমান।

হাসিনা পেছনের দিকে তাকালো, রেহমানের দিকে তাকালো, আবার পেছনের দিকে তাকালো। হাসিনা দেখলো সূর্যাস্তসদৃশ গোলাপগুচ্ছের চারটি গোলাপ তুষার-বলে পরিণত হয়েছে; পঞ্চম একটি গোলাপের ভেতর থেকে তুষারকণা উঠে এসে—সঙ্গত যেমনভাবে লাভা উঠে আসে ভেতর থেকে—ধিরে ফেলছে গোলাপটিকে—চেকে যাচ্ছে ঝকঝকে পম্পেই, ছায়াসুনিবিড় গ্রাম, বলোমলো নদী, বাঁশপাতার মতো পথঘাট।

তুষারপাত ও প্রবাহ-দশলাখ ডানাঅলা রিজার্ড—বাঢ়েছে ক্রমশ। গাড়িটি পরিণত হয়েছে উভৰ মেরুর কোনো এক খওাংশে, যেখানে প্রকৃতির সমস্ত আনন্দ প্রকাশ পায় তুষারঝড়ের রূপ ধ'রে। উড়জীন পাখি বরফ হয়ে ঝপ ক'রে তুষারস্তুপের নিচে ঢোকে; শাদাভালুক ঢাকা পড়ে; মৃত্যু-শাদা তুষার-চাদরে নিঃসঙ্গ যাত্রী চিরস্থির হয়। তুষার কি জন্ম নেয়? তুষার কি রক্তের ভেতর থেকে জ্যাট বেঁধে উঠে আসতে পারে, যেমন আসে ক্ষুধা-কাম-স্পন্দন-প্রতিহিংসা?

রেহমান বললো, ‘আমার ভেতর কি যেনো একটা এইমাত্র বরফে পরিণত হলো।’

‘কী সেটা’ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো হাসিনা, ‘ওটা কি বুকের বাঁ দিকে?’

রেহমান আস্তে আস্তে বললো, ‘তাই তো মনে হচ্ছে।’

হাসিনা বললো, ‘আমার বাঁ স্তনটি কেমন বরফ হয়ে যাচ্ছে।’

হাসিনা তার স্তনটি খুলে ধরলো। রেহমান হাত দিয়ে দেখলো নরম কোমল উষ্ণ প্রায়-এক-বছর-ধ'-রে-চেনা স্তনটি ঠাণ্ডা বরফপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এটিই তার প্রিয়তর ছিলো—ডানটির থেকে আকারে একটু বড়ো, নিচে একটা লাল তিল আছে, বোঁটাটাও কেমন বউ-বউ মা-মা ভাব ক'রে থাকে সব সময়; চাইলেই দুধ আর অমৃত ঢেলে দেবে এমন একটা আশ্বাস ওর বৈঁটায়। খুব খারাপ লাগলো রেহমানের; টিপে দেখলো একটুও নড়ছে না; বেশি জোরে চাপ দিলে হয়তো চুরমার হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে তুষার জমে উঠছে গাড়ির পেছনে, পেছনের সিটে;—গাঁড়োগাঁড়ো, চাকচাক, গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে। গাড়ির ছাদটাকে আকাশের মতো মনে হচ্ছে, হিমালয়ের কোমরের মতো মনে হচ্ছে, যেখান থেকে নেমে আসছে তুষারঝড়, আভালাঙ্গি, হিমবাহ। কোথা থেকে দুটি তুষারিত পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে গাড়ির সিটে পড়লো। মনে হলো পেছনের সিটে একটি অতি পরিচিত রাস্তা তুষারের তলে ঢাকা পড়ছে, ঢাকা পড়ছে আকাশ থেকে ছিটকে-পড়া নক্ষত্রের আলো, গাছ থেকে বরা সবুজ ধূসর পাতার কোলাহল, তরঞ্জ-তরঞ্জি বৃন্দ-কৃষক মোষের প্রাত্যহিক পদধ্বনি। কারা যেনো, হয়তোবা দশটা দুষ্টু কিশোরকিশোরী, সে-তুষারে মাতামাতি করছে; তুষার-বল ছুঁড়ে মারছে পরম্পরের দিকে, অথচ সেখানে কেউ নেই। একটা খেত ভালুকের গোঙানি শোনা গেলো; একটা সারসের চিৎকার কানে এলো; দুজন আরোহী নিয়ে একটা গাড়ির তুষারগহ্নের চুকে যাওয়ার কষ্ট কানে এলো—যদিও সেখানে কেউ নেই। গাড়ির পেছনের কাচটি তুষারদেয়াল হয়ে গেছে; তার ওপর অস্পষ্ট সুদূর করঞ্জ শৃতির মতো বহির্জগত থেকে রৌদ্র এসে পড়ছে।

‘আমাদের একটু উষ্ণতা দরকার, আমরা তুষারে ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছি’, রেহমান বললো।

হাসিনা রেহমানের পকেট থেকে লাইটার নিয়ে জ্বালানোর জন্যে চাপ দিতেই আগনের বদলে আশ্চর্য সুন্দর এক টুকরো বরফ মাথা তুলে দাঁড়ালো। বরফের আগনের ঠাণ্ডায় আর সৌন্দর্যে আরেকটুকু জ'মে গেলো হাসিনা।

‘আমাদের জন্যে কোনো উষ্ণতা নেই’ তুষারমাখা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো হাসিনার ভেতর থেকে। তার দীর্ঘশ্বাস তুষার-ধূলো হয়ে চারপাশে উড়তে লাগলো।

‘কিছুটা শৃতির আগন তুলে আনো, হাসিনা’ অনুরোধ জানালো রেহমান।

হাসিনার মাংসের ভেতর পুনরায় তার প্রিয় বোধটি এলো। রেহমান এক মৌমাছি, সে বস্তু থেকে অনায়াসে মধু তুলে আনে; আমার শরীরের মধু।

‘সে-রাতটি আমার মনে পড়ছে’, আস্তে বললো হাসিনা।

রেহমান জানতে চাইলো, ‘কোন রাত?’

‘আমাদের সঙ্গের প্রথম রাত’ বললো হাসিনা, ‘সঙ্গম আমার ভালো লাগে।’

দ্বিক্ষণিক তীব্র শব্দটি নিয়ে রেহমান ভাবলো—কোনোভাষায়ই এ-ব্যাপারটির সম্পর্কে কোনো যথার্থ শব্দ নেই। প্রচলিত সংস্কৃত ইংরেজি শব্দ নিরীয়, বৃদ্ধ; চলতি ইংরেজি বাঙ্লা শব্দ ঘিনঘিনে। সর্বক্রিয়ায় সহায়ক বাঙ্লা ‘ক্ৰ’ ধাতু বিশেষ বিশেষ সময়ে ভয়ৎকর অশ্লীল। কিন্তু হাসিনার গলায় এটি অদ্ভুত শোনায়; তবে তার গায়েও এখন তুষার লেগেছে।

আরো একশো মাইল দূরে মধুবাজার; সেখানে সমুদ্র আছে, নিসর্গ আছে; তুষার নেই; চকচকে উপজাতীয় তরঙ্গতরঙ্গী আছে। রেহমান-হাসিনার প্রথম দেখা হয়েছিলো এক মিশ্রপার্টিতে;—ড্রামের শব্দে বাঁশির বৰ্বৰ কান্নায় নাচের তালে উড়েছিলো কাঁপছিলো বাজছিলো সন্ধ্যাটি। রেহমানের মনে হয়েছিলো হাসিনা একটি বিয়ার-পাত্র; এক চুমুকে সে তার সম্পূর্ণ বিয়ার পান করতে পারে। হাসিনা ত্রিনিদাদ থেকে আনা একটি ড্রাম; তাকে সে সারারাত বাজাতে পারে। হাসিনা একটা ছ-ছিদ্রের বাঁশির বাঁশি; গামছা প’রে সে তাকে সারাদিন সারারাত ধানক্ষেতের পাশে তালগাছের নিচে ব’সে বাজাতে পারে। রেহমানকে হাসিনার মনে হয়েছিলো একটা ঝকঝকে রেলইঞ্জিন দু-পায়ের মতো ছড়ানো রেলের ওপর দিয়ে যে ঝেকেঝেকে ঘন্টায় দুশো মাইল যেতে পারে। মনে হয়েছিলো রেহমান একটা মৌমাছি, বস্তু থেকে সে মধু সংগ্রহ করতে পারে দশ্নেশোষণে। সে-রাত তারা ঘুমিয়েছিলো পরম্পরের তেতরে, একে অন্যের মাংসের স্বপ্নের ক্ষুধার ভেতরে চুকে। গাড়ি এগিয়ে চলছে মধুবাজারের উদ্দেশ্যে, সেটিরও রক্তমাংসের ভেতরে যেনো তুষারপ্রবাহ বইছে। কিছুটা তাপ বোধ করছিলো। হাসিনা; কিন্তু পরমুহূর্তে সে টের পেলো তার কানের পাশে তুষার জমছে। টোকা দিয়ে সরিয়ে দিতেই, হাসিনা লক্ষ্য করলো, আরেকটুকু তুষার অন্ধ সময়ের মধ্যে জ’মে উঠলো। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো সূর্যাস্তলাল গোলাপগুচ্ছ তুষারস্তুপে পরিগত হয়েছে। কোথা থেকে আসে এ-শাদা ধৰধৰে হিংস্র বিষাক্ত তুষার? সৌরলোকের কেন্দ্ৰবিন্দু থেকে কি ঝ’রে পড়ে আস্তেআস্তে পাহাড়ের মস্তকে মানুষের হৃদপিণ্ডে পাখির পালকে পুষ্পের পাপড়িতে? পেছনের সিট তুষারে ভরাট হয়ে গেছে, তিল পরিমাণ জায়গা নেই। শাদা তুষার জ’মে আছে; তার ভেতরে জ’মে আছে গোলাপস্তবক, মরা পাখি; নিচে লুপ্ত হয়ে গেছে অজস্র চেনা রাস্তা,

[boighar.com](http://www.boighar.com)

বাড়িঘর, পুকুর, ধানক্ষেত। গাড়িটা হঠাৎ গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো। তেলের চোঙে
তুষার জমেছে সস্তবত, ব্রেক-পাদানির নিচে শক্ত হয়ে আছে মেরুদেশি বরফ।
হাসিনা তার ব্লাউজটি খুলে ফেললো, বেহমানকে দেখালো যে তার ডান স্তনটিও
ইতিমধ্যে তুষারিত হয়ে গেছে। চিংকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হলো [রেহমানের](http://www.boighar.com),
কিন্তু টের পেলো তার গলনালিতে তুষার জমেছে;—বোবার মতো সে তাকালো
হাসিনার ধবধবে স্তন দুটির দিকে; তাকিয়েই তার পাহাড়ের গঠনপ্রণালির কথা
মনে পড়লো। চিংকার করলেও ও-দুটি আর নরম হবে না, সুখ ঢালবে না, মুখের
ভেতর চুকে পিছলে বেরিয়ে আসবে না। ওই তো পাহাড়—স্পষ্ট দেখতে পেলো
রেহমান—চুড়ো দেখা যাচ্ছে, মালভূমি দেখা যাচ্ছে, কাঁধ, পদতল, গদি, গিরিপথ
দেখা যাচ্ছে, যা যে-কোনো ভৌগোলিককে আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তার রক্তে
বিষ ঢেলে দিচ্ছে। রেহমান টের পেলো তার পা দুটি জ'মে গেছে; চিমটি কেটে
দেখলো কোনো ব্যাথা লাগছে না। চিমটি কাটতেই সে পারে নি, পিছলে এসেছে
তার নখ। যখন তার পা জমছিলো, তখন রেহমান বোধ করছিলো তার একটা
বড়ে মোটা রকমের নালির ভেতর দিয়ে গড়াছিলো ঠাণ্ডা স্রোত, যা নেমে
আসছিলো দেহের উর্ধ্বাংশ থেকে। সবচেয়ে বিশ্রী লাগছিলো রেহমানের যখন তার
পুরুষাঙ্গটি বরফীভূত হচ্ছিলো। এখন তার পৌরুষ একটা শাদা ধবধবে তুষারদণ্ড।
হাসিনা লক্ষ্য করলো তার নাভির ভেতর তুষার জমেছে। আবেকটুকু নিচে তুষার
জ'মে পায়ের দূরতম প্রান্ত থেকে বিশুদ্ধ ত্রিভুজ পর্যন্ত শাদা হয়ে গেছে। পা জ'ম
যাওয়ার সময় সামান্যও টের পায় নি সে, কিন্তু তুষার যখন দশদিগন্তে আধিপত্য
বসাছিলো রেহমানের জয়পুরাজয়তরা একান্ত সাম্রাজ্যে, তখন সে লিঙ্গার্ডের তাড়া
বোধ করছিলো তীব্রভাবে।

‘বাইরে রৌদ্র, আকাশে মেঘ নেই, অথচ আমরা বরফের মধ্যে চুকে যাচ্ছি’,
বিড়বিড় করলো রেহমান।

বাঙ্লাদেশের প্রাচীনতম ভূগোলগ্রন্থেও তুষারপাতের বিবরণ পাওয়া যায় না;
আলবেরুনির ঝুপকথামালায়ও এমন ঝুপকথার ইঙ্গিত নেই; আজকের আবহাওয়া
বিভাগের রটানো বার্তায় বৃষ্টি-সম্ভাবনারও কোনো উল্লেখ ছিলো না। রেহমান
গাড়িতে ওঠার সময় দেখে এসেছে পাশের বাড়ির মেয়েটি নাভি মানসসরোবরের
মতো মেলে স্তন দুটোকে খোঁপার মতো সাজিয়ে বেরোচ্ছে। তার পোশাকেও তুষার
বৃষ্টির কোনো আভাস ছিলো না।

‘আমার বুক পর্যন্ত তুষারে ঢেকে গেছে’, হাসিনা জানালো।

রেহমান দেখলো হাসিনার বুক পর্যন্ত তুষারিত; উচ্চতা নিম্নতা নেই
কোনোখানে। রেহমানেরও বুক পর্যন্ত তুষার। একটা স্তন চোখে পড়লো হাসিনার
‘মধুবাজার—দশ মাইল।।’ আনন্দে সে চিংকার করতে গিয়ে থেমে গেলো; তার

কঠনালি তুষারের দখলে ।

‘আমরা একটু পরেই মধুবাজার পৌছবো’, ভাবতে চাইলো হাসিনা; কিন্তু অনুভব করলো তার ভাবনার শরীরেও তুষার লেগেছে ।

‘মধুবাজারে পৌছতেই হবে’ প্রতিজ্ঞা ক’রে গতি বাড়লো রেহমান; কিন্তু গতি বাড়লো না, গাড়িটা শুধু কাঁইকাঁই ক’রে উঠলো ।

তুষার জমছে—তুষার রেহমানের বুকে, হাসিনার রক্তে, রেহমানের মাংসে, হাসিনার স্বপ্নে, রেহমানের বগলে, হাসিনার মূলনালিতে, হাসিনা-রেহমানের চক্ষুমণিতে, রেহমান-হাসিনার মগজে-স্বপ্নে । ভেতর থেকে, বাইরে থেকে, রক্তের অভ্যন্তর থেকে, মাংসের ক্ষুধা থেকে উৎক্ষিণ্ঠ হচ্ছে তুষার । তাদের রক্ত মাংস স্বপ্ন কাম অস্থিমজ্জা এমনভাবে তুষারান্তরিত হয়ে গেছে যে দেখে বোকার উপায় নেই এ-তরঙ্গী একদা স্তন-যোনি-স্বপ্ন ধারণ করতো; আর তার পার্শ্ববর্তী তরঙ্গ মালিক ছিলো হৎপিণ্ড-পুরুষাঙ্গ-প্রেমের । অবশেষে গাড়িটি এসে মধুবাজারে পৌছালো । তখন গাড়িটি তার আরোহীদের নিয়ে একটি বড়ো বরফপিণ্ডে পরিগত হয়ে গেছে;—শেষ তুষারকণা হাসিনা ও রেহমানের দৃষ্টিকে ঢেকে দেয়ার আগে তাদের চোখে পড়লো একটা ঝোপের আড়ালে এক চিলতে রোদে একটি উপজাতীয় তরঙ্গী একটা স্তন ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার তরঙ্গের বিশাল মুখের ভেতরে । শেষ তুষারকণা দুটো তাদের চোখে জ’মে উঠলো ।

মহাম শয়তান



সচিত্রকরণ কাইয়ুম চৌধুরী

তাঁর অপেক্ষায়ই ছিলো সবাই;—ওই নদী, ঠাণ্ডা বাতি, আব তারারাশি; দস্তা-কড়া
দিন, ঝুলন্ত যাত্রী, চাষী; ইঙ্গুলের শিশুরা, প্রতিটি রাইফেল ও সেনাপতি,
রাজ্যপতি, শেফালির বিষণ্ণ বন; ছাত্রা, দাগীচোর ও খুনীরা। প্রথমে তবু কেউ

খেয়াল করে নি তিনি এসেছেন। বেশি অপেক্ষায় ও বেশি আগ্রহে ছিলো ব'লে তাকে দেখতে ও বুঝতে দেরি করেছে সবাই;—কোটি কোটি পুরুষ ও স্ত্রীমানুষ; কেননা বেশি আগ্রহে অপেক্ষায় চোখে আর স্নায়তে ছানি পড়ে, অনুভূতিমণ্ডলে দেখা দেয় সংবেদনশূন্যতা। মানুষের থেকে প্রাকৃতিক বস্তুদের ইন্দ্রিয় অনেক তীক্ষ্ণ, আবেগঅনুভূতি অনেক স্পর্শকাতর; তাই তাঁর আবির্ভাব আর আগমন সবার আগে টের পায় শহর থেকে সত্তর মাইল দূরে দাঁড়ানো একটি কিশোর খেজুরগাছ। এরপর তাঁর আবির্ভাব, শরীরমনে, বোধ করে রাজধানির অভিজাত অঞ্চলের একটি পনেরো বছরের কিশোরী, ও নারায়ণগঞ্জের বেশ্যাপল্লীর এক জীর্ণ কুংসিত মরণযাত্রী। এ-তিনটি বিচ্ছিন্ন সত্ত্বার মধ্যে বাস্তব ও অবাস্তব কোনো যোগ ছিলো না, কিন্তু তাদের এক তত্ত্বতে বেঁধে দিলেন তিনি, মহিমার যাব শেষ নেই; যার রঙিন উজ্জ্বল হিংস্র প্রতিভায় সারা পৃথিবী পূর্ণ হয়ে আছে। মুর্খ পাড়াগাঁয়ের একটি মরা খালের পাড়ে গত তিন বছর ধ'রে অত্যন্ত অবলীলায় আকাশের দিকে মস্তক বাড়াচ্ছিলো খেজুরগাছটি;—দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যে সুগঠিত। এবারের শীতে তাঁর রস দেয়ার কথা; মাতবরচর থেকে যে-গাছটি প্রতি শীতে ওই গ্রামে এসে বাসা বাঁধে আর গাছ কাটে, সে গাছটির ডালাপালা বেশ চমৎকারভাবে ছেটেছে, এবং গাছটিতে যাতে প্রচুর রস পড়তে পারে, তাই বড়ে ক'রে মুখ কেটে নালি পেতেছে। গাছটি কাটার সময় মাঝিবাড়ির ড্যাকরা যুবতীটির কথা গাছির মনে পড়ছিলো বারবার; তাঁর বিশ্বাস এ-শীতে ওই এলাকায় ওই দুজনের সমান রস আর কেউ দিতে পারবে না। গাছি যেদিন গাছে নালি বসিয়ে হাড়ি পেতে গেলো, তাঁর পরেই গাছটি শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে। প্রথম জননীর মতো অচেলে রস ঝরানোর ইচ্ছে ছিলো গাছটির; কিন্তু রসের প্রথম ফোঁটা তাঁর ভেতর থেকে চুইয়ে আসার চেষ্টা চালাতেই গাছটি প্রচণ্ড বিষক্রিয়া বোধ করে। গাছটি অনুভব করে যে তাঁর শির আর শেকড় ও চারপাশ থেকে বিন্দু বিন্দু চুইয়ে নালির দিকে উঠে আসছে কালো বিষ, তাঁর শরীরটি পরিণত হয়েছে এক বিশাল বিষাক্ত কালসাপে, যার কালো বিদ্যুতের মতো দাঁত থেকে উৎসারিত হচ্ছে আদিম গরল। গাছটি রঙ বদলিয়ে ক্রমশ কালো হ'তে থাকে, যন্ত্রণায় গাছটি কাতরে উঠে। একবিন্দু বিষ তৈরি যতো কঠিন এক হাড়ি রস তৈরিও ততো কঠিন নয়। বিন্দু বিন্দু বিষ এক সময় বিষস্তোত্রে পরিণত হয়ে জমতে থাকে নতুন হাড়িতে; কিন্তু গাছটি যতোটা বিষ জমায় হাড়িতে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ছোবল অনুভব করে তাঁর স্নায়ুরাশিতে। যে-রাখালছেলেটি গাছটির নিচের কোলায় প্রত্যেক বিকেলে দুটি গরু আর একটি ছাগল চরায়, একসময় তাঁর চোখে পড়ে যে ছাড়াবাড়ির ওই গাছটি কাটা হয়েছে। সে আস্তে আস্তে গাছে ওঠে, এবং রস খাওয়ার জন্যে গাছটির মুখে এক ব্যাপক বিস্তৃত চাটুনি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মরা পাতার মতো

খ'সে পড়ে, এবং গাছটি প্রচণ্ড শব্দে দু-ভাগ হয়ে যায়। রাজধানির অভিজাত অঞ্চলের পঞ্চদশী কিশোরীটি বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যসৌন্দর্যের শুল্ক প্রতিমা; তাকে দেখে অনেকেই ভাবতো যে বিশুদ্ধ কৃপসৌন্দর্য দুর্দশাগ্রস্ত এ-গ্রহে এখনো www.boighar.com উপকথায় পরিণত হয় নি। তার স্তন দুটি কোনো পাপী হাতের পরিচয়া ছাড়াই বিস্তৃতি পেয়েছে—দিগন্তের মতো; নিটোল উচ্চতাও পেয়েছে নীলিমাতুল্য, যাতে পাশাপাশি জুলে দুটি অদেখ্য ধ্রুবতারা। সে যে-ব্লাউজ পরে তাতে বেশ দূর থেকেও দিগন্তরেখা দেখা যায়, তার বর্ণমালা চোখে এসে ঢোকে। তার পায়ের পাতা, জংঘা, উরু, পাছা অত্যন্ত সুগঠিত; তার জিসের নীল পুরু আবরণ সত্ত্বেও সৌন্দর্যপিপাসুরা তার ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর নিটোলতা সম্পর্কে সন্দেহহীন সিদ্ধান্তে পৌছেতে পারে। তার ওষ্ঠ, কঠিনদেশ, চোখ, চিবুক, মুখমণ্ডল বিশ্বকর শোভাখচিত; কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল এমন কোমলমসৃণ যে তাতে হাত ঢোকালে মনে হবে বার্লিন নরম স্তুপের ভেতর চুকচে আঙুল। তার কোনো খুঁত ছিলো না ব'লে শুধু বুড়োরাই তার দিকে ভেজা চোখে তাকাতো না, যুবকেরাও থমকে দাঁড়াতো। বুড়োদের মধ্যে পঁচাত্তর বছর বয়স্ক একজন, ঝংগু হৃৎপিণ্ডবশত পদচুর্য মন্ত্রণাদাতা, তার দিকে তাকিয়ে এক দুপুরে ভেবেছিলো যদি ওর সাথে পাঁচ মুহূর্ত ঘুমোতে পারতাম, তবে আমি অবশ্যই ফিরে পেতাম আমার হারানো স্বাস্থ্য-যৌবন-হৃৎপিণ্ড! সে একটি সত্য চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছিলো যে কিশোরীদের মতো সৌন্দর্য ও আবেদনময় আর কিছুই নেই। তার আঙুল থেকে বের হতো ভোর, চোখে উঠতো মধ্যারাতের বিখ্যাত চাঁদ, ওষ্ঠে কাঁপতো লালপদ্মদিঘি। কোনো অসুখ অসৌন্দর্য তার ছিলো না, ব্যাধির কোনো কারণও ছিলো না। একটু দূরের বস্তির এক হাজার কিশোরী যেটুকু প্রোটিন প্রহণ করতো, সে একাই গ্রহণ করতো তার চেয়ে বেশি; আর সংস্পর্শজাত রোগ ঘটারও সম্ভাবনা ছিলো না। তার বিচরণস্থানগুলো ছিলো পরিস্তুত, যাদের পাশে বসতো তারা আজন্ম নীরোগ; যাদের পোশাকআশাক তার গায়ে লাগতো, তাদের পোশাক ছিলো তাদের মতোই পরিচ্ছন্ন। ওই কিশোরী কারো সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হয় নি, কারো ঠোঁটেও তার ঠোঁট লাগে নি, যদিও স্বপ্নে কয়েকবার সে এমন ঘটনায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু অমন অংশ তো সবাই নেয়। সেদিন সন্ধ্যায় নাচের আসরেই সে প্রথম শ্রান্তি বোধ করে, যা সে আগে আর কখনো করে নি। উদ্দাম স্বর সূর আলো ও নাচের মধ্যে হঠাত ভাস্কর্যের মতো সে স্থির হয়ে পড়লে তার সঙ্গী বিশ্বয় বোধ করে; এবং তাকে নাচতে অনুরোধ করে। কিন্তু সে কিছুই শুনতে বা দেখতে পায় না; অনেকক্ষণ পাথুরিত থাকার পর কিশোরীটি রজপ্রবাহ ফিরে পায়, এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মেঝের এক কোণে ব'সে পড়ে। ওখানকার তুমুল জীবনোল্লাসের মধ্যে তার দিকে মনোযোগ দেয়ার কথা কারো মনে পড়ে নি,

তাতে তার অনেকটা ভালোই লেগেছে। ব'সে-থাকা অবস্থায় তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি ভীষণ ব্যথায় শিউরে উঠলে সে ডান হাত দিয়ে সেটিকে চেপে ধরতে গিয়েই বিভীষিকা দেখে কড়ে আঙুলটি বাঁকা আঙ্গিচ মতো খ'সে পড়েছে তার ডান মুঠোতে। সৌন্দর্যের কথা ভেবে সে চিংকার ক'রে উঠলে তার কঢ়ে কোনো স্বর জন্ম নেয় না; কঢ়ের যেসব তন্ত্র কাঁপনে জাগে স্বর, সেগুলো তার গলার তেতর এলোমেলোভাবে জড়িয়ে যায়। সে দৌড়ে বাইরে আসে, গাড়িতে ওঠে, ও বাসায় পৌছে। আপন অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলে সে সম্পূর্ণরূপে;—নিজেকে তার নিঃশব্দ বেড়াল, ডাষ্টবিনের মরা ইঁদুরের লেজ, চুরমার-হয়ে-যাওয়া গুাশ, আকাশের দিকে উদ্যত টাওয়ার, নর্দমার ভাসমান লাল-হলুদ মলখণ্ড ব'লে মনে হয়। ভাঙা নৌকোর মতো সে ঢোকে শোয়ার ঘরে। পরের দিন যখন বেলা অনেক হয়েছে, তার ইঁস্কুলে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে, তার মা তাকে জাগাতে এসে চিংকার ক'রে উঠলে বাড়ির সবাই, অর্থাৎ দুটি কাজের মেয়ে, একটি কাজের ছেলে, ও ড্রাইভার এসে জড়ে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই জড়ত্ব অর্জন করে; কারো মুখে কোনো কথা সরে না, তারা সবাই দোজখি বিভীষিকা দেখতে থাকে। তার পা, আঙুল থেকে উরু পর্যন্ত, প'চে গ'লে গেছে; আর তার তেতরে ঢুকে গেছে ট্রাউজারের কাপড়। পচা মাংস ও ট্রাউজারের কাপড় মিলেমিশে শুকিয়ে এমন হয়েছে যে পা দুটিকে সামুদ্রিক বাইনের শুটকির মতো দেখাচ্ছে। মাংস ও ট্রাউজার এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে চেনা শক্ত কোনটুকু আল্লার আর কোনটুকু দর্জির। কিন্তু ডান পায়ে দেখা যায় এক বিশ্বকর ব্যাপার। পায়ের পাতাটি নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি, কিন্তু একটি আঙুল লোকোভর সৌন্দর্যের মতো অল্পান হয়ে আছে। অন্ত বিভীষিকালোকে সেটি এক গোলাপপাপড়ি, যার সুগন্ধ আর আভা আছে, তার তেতরে সুস্থ রক্তের পরিক্রমা বাইরে থেকেও দেখা যায়। শোকগ্রস্তদের একজন নিজেকে অতল শোক থেকে উদ্ধার ক'রে চিকিৎসক আনার কথা শ্বরণ করায়। চিকিৎসক ঘরে ঢুকেই অদৃশ্য কোনো মহানভবের আপার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া বোধ করে। এ-কিশোরী তার অনেক দিনের চেনা; তার যে-সামান্য চিকিৎসা এতোদিন দরকার হয়েছে, তা সে-ই করেছে। এই প্রথম চিকিৎসক অভিবিতকে দেখতে পায়। মানবদেহের এমন বিকারের কথা সে কোনো বইয়ে পড়ে নি, বাস্তবে দেখে নি। সে নিঃশব্দ চিংকার ক'রে ওঠে; তাতে পরম করঞ্চাময় না পরম প্রতিহিংসাময়ের নাম উচ্চারিত হয়, তা বোঝা যায় না। ‘কী রোগ হয়েছে এ-কিশোরী?’—ডাঙ্কার নিজেকে বা নিরাশাকে মনে মনে জিজ্ঞেস করে। ‘এ কী রোগ, না তাঁর উপস্থিতি?’—এমন বোধ তার মনে জন্ম নেয়ার সাথে সাথে এক রকম পুলক বোধ করে ডাঙ্কার; কিন্তু পরমহৃত্তেই জন্ম নেয় তার কর্তব্যজ্ঞান, এবং সে রোগশনাক্তির দিকে মন দেয়। শনাক্তির জন্মে দরকার

কিশোরীর শরীরটিকে পা-থেকে-মাথা পর্যন্ত, বিকৃতি থেকে বিকৃতি পর্যন্ত, দেখা। সে কিশোরীর গায়ে লেটে যাওয়া জিন্স ও ব্লাউজ অপসারণের উদ্যোগ নেয়। এক রকম আরক কিশোরীর শরীরে লাগিয়ে কশাইয়ের মতো ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে পোশাক সরাতে থাকে কিশোরীর শরীর থেকে মাঝে মাঝে ছিঁড়ে আসতে থাকে পচা মাংস, ভাক ক'রে ছিটকে পড়ে নর্দমার পানির মতো বিমর্শ রক্ত আর ঘোলা মেদ। পা দুটি আবিষ্কার করতে চিকিৎসকের অনেক সময় লাগে। প্রথম দিকে ছুরি চালাতে বেশ কষ্ট হয় চিকিৎসকের; বমির মতো তেতুর থেকে উঠে আসে কান্না; কিন্তু ক্রমশ সে শাস্তি ফিরে পায়। এক সময়, সে যখন উরুর দিকের পোশাক খসাছিলো, তার চোখে অর্নিবচন উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। বোঝা যাছিলো সে আনন্দ পাচ্ছে, অনন্তকাল ধরে এ-কিশোরীর বিকৃত দেহ—পুজ, পচা রক্ত, ঘোলা মেদ, চ্যাপ্টা কৃমি—নাড়তে তার কষ্ট হবে না। দু-উরুর সন্ধিস্থলে খোঁচা দেয়ার সময় অনেকখানি পচা রক্ত মাংস মেদ চরম দুর্গন্ধসহ ঝ'রে পড়লে তার প্রতিভা আরো বিকশিত হয়, কাজে উৎসাহ বাঢ়ে। ঘরে নিকটাঞ্চীয় যারা উপস্থিত ছিলো, তাদের মনেও এক রকম অস্পৰ্শ স্তর উল্লাস সঞ্চারিত হয়। ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখা দেয় সেই মহানালি, যা এখন দুঃস্ময়ের মতো, পুচা মাংসের সঙ্গে যা দিয়ে থিতিয়ে নামছে নরক। অর্ধেক সফলতার পর চিকিৎসক পূর্ণ সাফল্যের জন্যে কিশোরীর ব্লাউজ সরানোর কাজে মন ও হাত দেয়। নাভির দিকে সিঙ্ক ও সিঙ্কের চেয়ে মসৃণ চামড়া মেদ মাংস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চিকিৎসক মাংস ও সিঙ্কের পার্থক্য করছিলো এভাবে যে খোঁচা দিলেই মাংস খ'সে পড়ছিলো, কিন্তু উন্নত কৌশলে প্রস্তুত সিঙ্কের তন্তু ছিঁড়েছিলো না। বস্তুই অবিনশ্বর, আর সব নশ্বর। খোঁচা দিতেই ধস নামে নাভিএলাকায়, দেখা দেয় একটি লালরক্তময় গর্ত। একটু ওপরে পাঁজরের শাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে মাংস সরিয়ে। স্তনাঞ্চলের কাপড় সরানোর সময় দু-স্তর কাপড় খৌজে চিকিৎসক, কিন্তু সে অবিলম্বেই বুঝতে পারে যে বক্ষবন্ধনি নামক বস্ত্রটি সে পরে নি। তার বাঁ দিকের স্তনটি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে সেখানে ঠাঠা করছে শয়তানের অটুহাসি, যার একদিক দিয়ে গ'লে পড়েছে অশু অন্য দিকে উচ্ছলে উঠেছে উল্লাস। বছর তিনেক আগে যখন কিশোরীর স্তন উদগত হচ্ছিলো, তখন কী একটা অছিলায় ডাক্তার তার বাঁ দিকের দুধটি দেখেছিলো। স্তন শব্দটি সহজে ডাক্তারের মনে আসে না; নারীদেহের ওই অংশকে যে স্তন, পয়েধর প্রভৃতি দুর্বোধ্য শব্দেও ডাকা হয় ডাক্তার তা শিরেছিলো প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হওয়ার পর; আবাল্য সে জেনে এসেছে ওই অংশের নাম দুধ; তাই নারীবক্ষ ভাবতে সে দুধ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শ্বরণ করতে অনেক সময় নেয়; তাই বালিকার বুকের কথা ভাবতে দুধের কথাই তার মনে হয়। সে দেখেছিলো শীর্ষদেশে একটি ধুবতারা, আর তার তলায় একটি তিলের আকারে

লালগোলাপ। কিন্তু এখন তার কী পরিণতি! কিন্তু চিকিৎসক ও অন্যরা এ-বিভীষিকাও সহ্য করতে পারছিলো, তবে তাদের সমস্ত সহ্যশক্তি মুহূর্তে খান খান হয়ে যায় যখন ডান স্তনের কাপড় মোচন করা হয়। এ-স্তনটির কিছুই হয় নি;—একটি বিশাল মুক্কের মতো টলমল করছে স্তনটি, তেতর থেকে বেরিয়ে আসছে রঙিন আভা, দৃতি বলকে পড়ছে চারপাশের দোজখে, চিকিৎসকের আঙুলের ছোঁয়ায় সেটি ধরথর ক'রে উঠছে, যেনো রঞ্জগোলাপের বনে বইছে ঝড়। অশ্যে নরকও সহ্য করা যায়, কিন্তু তার মধ্যে ক্ষীণ স্বর্ণের ওদ্ধত্য সমস্ত স্নায় ও কল্পনাকে এমন কড়াভাবে আগুনের চাবুক মারতে থাকে যে তাতে মানুষের মতো দানবেরাও মুর্ছিত হয়। এখানেও তাই হয়, সবাই কিছুক্ষণের জন্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এখন কিশোরীর সারা শরীর নগ্ন, অথবা নগ্ন শুধু ডান স্তনটি, আর সব দুর্ভেদ্য বিভীষিকাপরা। সবাই দেখে তাদের চোখের সামনে সীমাশূন্য স্থানকাল ভ'রে ছুরিয়ে আছে নরক, যার বুকে অনন্ত হাহাকার হয়ে ফুটে আছে বেহেশতি সৌন্দর্যখচিত একটি স্তন। নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের বস্তিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে অন্যরূপে। ফেলু ব্যাপারীর ঠিক বয়স কতো বলা অসম্ভব; কেউ বলে আশি কেউ বলে পঁচাত্তর; সে গত কুড়ি বছর ধ'রে প'ড়ে আছে নর্দমার ধারে। তার সমস্ত অঙ্গই বিকল, কোনোটাই ঠিকমতো কাজ করে না। গুলি খেয়ে ভেঙে যাওয়া শুকুনের পায়ের মতো তার পা দুটি ঝুলে আছে কুঁচকি থেকে। চোখ দুটি বুঁজতে বুঁজতে একেবারে বুঁজে গেছে, তার মধ্যে যেটিতে সামান্য আলো এখনো ঢোকে সেটিকে সে নোংরা নখ দিয়ে খুঁটে ফাঁক করে প্রত্যেক সকালে, যাতে পাড়ার তিন চার হাত শোভা তার চোখে পড়ে। বাহ দুটি উটপাথির ডানার মতো অতীতের শৃতি জাগায়মাত্র। মুখে ভালুকের বদহাসির মতো ঘা, তাতে খুব ক্লান্ত বুড়ো মাছি ছাড়া অন্য পোকাও বসে না। পাঁজরটি বেঁকেছে এমনভাবে যাতে মুখটি তার গোপন অঙ্গের আবরণে পরিণত হয়েছে। সে কোনো পোশাক না পরলেও তাকে নগ্ন মনে হয় না, কুৎসিত মনে হয় শুধু। সে তার রোগরাশি সংগ্রহ করেছে এ-বেশ্যাপল্লী থেকেই, এবং একেই পুণ্যস্থান ভেবে প'ড়ে আছে। তার রোগরাশি তার মাংসে কখনো ঢুকেছে আনন্দরূপে, কখনো ক্লান্তিরূপে। তার যৌবনের পাড়ানারীদের হাড় এখন মিলবে কোনো নামহীন শুশানে বা নদীনালার গর্ভে; তার প্রৌঢ়কালের পতিতারাও সময় রোগ পুলিশ শেপাই ও অন্যান্য ন্যায়রক্ষীর তৎপরতায় কোথায় চ'লে গেছে। গত কুড়ি বছরে সে কোনো বা কারো ঘরে যায় নি, কোনো শরীর ছোঁয় নি; কুঠগ্রস্ত নারীরাও তাকে ছুঁতে ঘেঁঠা করে। সে রোদে পড়ে থাকে নর্দমার পাশেই, বেশি বৃষ্টি হ'লে আশ্চর্য জিমন্যাস্টের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের বারান্দায় ওঠে, অনেক সময় ওঠেও না। কোনো চিকিৎসা তার হয় নি অনেক বছর, যদিও প্রথম দিকে সে চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলো।

তখন তার জীবনের মোহ ছিলো, কামনা ছিলো; কিন্তু ওইসব ছেড়ে দিয়ে এখন সে শুধুই বেঁচে আছে। কোনো কামনা বাসনায় নয়, নিতান্ত বাঁচার বাস্তবতায় সে বেঁচে আছে; মানুষের জীবনে যে বাঁচা ছাড়া অন্য কিছুও ঘটতে পারে, তার বোধ সে হারিয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু সবাই দেখছে সে মরছে না। তার অসুখের প্রথম দিকে যে-কিশোরীটি প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিলো, তার হাড় এখন শীতলক্ষ্মার ঠাণ্ডা জলে শান্তি পাচ্ছে। প্রথম কয়েক বছর সে চিকিৎসা চালিয়ে একদিন সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে তার কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন আছে; কিন্তু সে টিকে আছে গত কুড়ি বছর। এতে বিশ্বয় বোধ করতো সবাই; কিন্তু সে নিজে বিশ্বয়বোধ করে কয়েকদিন আগে;—অত্যন্ত বিহুল হয়ে পড়ে যখন সে বুঝতে পারে তার বাঁ দিকে ঢপচপ করতে শুরু করেছে কিছু একটা। অনেক দিন সে অমন শব্দ শোনে নি, দূরশূতির আওয়াজ শুনে শিউরে ওঠে সে। এক ঝলক আলো এসে ঢোকে তার খণ্ডন-না-করা কিশোরের গোপন প্রত্যঙ্গের মতো ঢোকে। এক পরিবর্তন-স্নেত তাকে নাড়া দিতে থাকে প্রতিমুহূর্তে, হঠাতে সক্রিয় কারখানার মতো তার শরীরের নানা ভাগে শুরু হয় পিষ্টনের ঢোকন-বেরোন, চক্রের আবর্তন, বিদ্যুৎপ্রবাহ, উৎপাদন। শরীরের যে-সব খোড়লে অনেক বছর কোনো তরল পদার্থ ঢোকে নি, সেখানে সজোরে কোলাহল শুরু করে উজ্জ্বল সুস্থ রক্ত। বলবান মোমের পেছনের পদযুগলের মতো সজীব শক্ত হয়ে ওঠে তার পা দুটি। পাঁজরটি সোজা হয়ে শির ওপরের দিকে উঠতেই লজ্জা লাগে তার, এতেদিন তার মাংসাশী লজ্জা ঢাকা প'ড়ে ছিলো ঢ'লে-পড়া মস্তকে; এখন তা নিরাবরণ হয়ে পড়েছে। বিশেষ পুলকের সঙ্গে সে লক্ষ্য করে যে-প্রত্যঙ্গটি তার জীবনযৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, যেটি বিকৃতবিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভের মতো, সেটি তাজা হয়ে উঠেছে, এবং সে কাম বোধ করছে। যৌবন দেখা দেয় তার সমস্ত অঙ্গে দোজখে ঢোকে দক্ষিণা, মাথা তোলে সবুজ তরংশ্রেণী, বেরোতে থাকে অদেখা ফুলের সৌরভ। তিনি তিনটি বিছিন্ন সন্তাকে এক সূত্রে বাঁধলেন। ঘটনা তিনটির তাৎপর্য প্রথমে জনসাধারণ বুঝতে পারে নি; তবে এ-ঘটনায় প্রথমে তারা স্তম্ভিত হয়, আহত হয় কেউ কেউ, কিন্তু অত্যন্ত ভেতরে সুখ পায় সবাই। যারা ঘটনা তিনটির কোনোটির প্রত্যক্ষদর্শী নয়, তারা ঘটনার বিবরণ শোনার সময় প্রেতলোকে প্রবেশের ভয় পায়, এবং অক্ষুট ধ্বনিপরম্পরা উচ্চারণ করে, যা ‘পরম করঞ্চাময় সবই তোমার ইচ্ছে’, ‘চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ সবই তোমার মহিমা’র মতো শোনায়। কে কী উচ্চারণ করেছে, তাও মনে নেই কারো; শুধু মনে আছে এক চরম বিভীষিকা ও বিভীষিকাউন্তর উল্লাস তাদের আত্মাকে দখল ক'রে ছিলো। তবে তাঁর আগমন সম্পর্কে অনেকে নিশ্চিত হয় আরেকটি ঘটনায়। শহরকেন্দ্রে অবস্থিত একটি গুঞ্জনময় শিশু ইঞ্জুলে

ঘটে ঘটনাটি। চমৎকার এলাকায় অবস্থিত এ-ইঙ্কুলচিটিতে অত্যন্ত চমৎকার গভর্নেন্স ও বাড়িতে জন্ম নেয়া শিশুরা পড়তে আসে। তাদের সুন্দর সুন্দর পিতামাতারা অনেক অসুন্দর ব্যাপারে জড়িত থাকলেও ওই শিশুরা পবিত্রতা ও সুন্দরতার মনুষ্যমূর্তি;—পাপ দারিদ্র্য কুশ্রীতাক্রিষ্ট পৃথিবীতে তাদের মুখ দেখলে যে-কোনো পাপী, ভিধিরি ও কুষ্ঠরোগীর মনেও শান্তি জন্মে। কলরবে দশদিক মুখর ক'রে তারা নামে নানান রঙের গাঢ়ি থেকে; সারা সময় সুরে হেয়ে রাখে তারা ইঙ্কুলের বাড়িঘর; চারদিকে ছড়িয়ে দেয় অলোকিক হাসি। কিন্তু সেদিন, রোববার, তারা ইঙ্কুলের উঠোনে পা দিতেই ভুলে যায় ভাষা ও হাসি; পরিণত হয় দু-শো শিশুর নিশ্চল নিঃশব্দ মূর্তিপুঞ্জে। সবাই ঠোঁটে ঠোঁট দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গভীরভাবে ব'সে থাকে, কখনো একসঙ্গে হাঁটে, কখনো আকাশের দিকে নির্বিকার তাকিয়ে থাকে, যেনো তারা অদৃশ্য কারো আরাধনা ও স্তবে ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

হেডমিস্ট্রেস প্রথমে উচ্চ চিকারে তাদের নেঃশব্দ www.boighar.com ও নিশ্চলতা ভাঙ্গাতে চান, কিন্তু তাতে তারা আরো নিঃশব্দ ও ভীতিকর হয়ে ওঠে। পরে ইঙ্কুলের সবচেয়ে ঝুঁপসী ও লীলাময়ী আপা তার নিপুণ কলাকৌশলে শিশুদের স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে সেও একসময় শিশুদের মতো নিঃশব্দ নিশ্চল হয়ে পড়ে। শহরশাসকগণ এ-সংবাদে প্রথমে উল্লিখিত ও পরে বিচলিত হয়ে পড়েন; কীভাবে শিশুদের ভয়াবহ ধ্যান ভাঙ্গানো যায় সে-কথা ভাবতে থাকেন। জনেক সেনানায়ক তাঁর বাহিনীকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেন, অনেক দিনের নিষ্ক্রিয়তায় তাদের পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে; পুলিশ বিভাগও তৎপরতা দেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করে; দমকলবাহিনী সাইরেন বাজাতে বাজাতে শহরের দিকে দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। একজন শোকাতুর ঝুঁপসী মাতা হ্যামিলনের বাঁশিঅলা জাতীয় কিছুর খৌজে বেরোন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে আসতে থাকে ভাঁড়েরা, নানা হাস্যরসাত্ত্বক খেলা দেখাতে থাকে; তাতে শিশুদের পিতামাতাদের শোক ও অশু কেটে যায়, তারা শিশুর মতো আমোদে মেতে ওঠে; কিন্তু পবিত্র শিশুরা আরো নিস্তর হ'তে থাকে, কেউ কেউ গালে হাত দিয়ে তয়ক্ষরভাবে কী যেনো ভাবতে থাকে। পিতামাতা, নগররক্ষী, ও বৃন্দদের আমোদ দেখে ভাঁড়েরা বিশ্বিতবেদনার্ত হয়; তারা এতেদিন এমন আমোদ কখনো দিতে পারে নি। এক সময় তাদের শরীরেও নিশ্চলতা নামে, নিস্তরতা নামে স্বরে ও চোখে; অবশেষে তারা অচল স্থিরতা পায়। তাদের অমন নিশ্চলতাকে আমোজনক ভাঁড়ামি মনে ক'রে পিতামাতারা খলখল ক'রে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, আর শিশুরা, লীলাময়ী আপা, ও ভাঁড়েরা থাকে পাথরের মতো শক্ত নিশ্চল। এ-সময় শহরের বড়ো রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে একটি লোক চিকার করে ওঠে; সে নাকি পরম বিশ্বয়কর কিছু দেখেছে যা আগে কোনোদিন দেখে নি। দুপুরে কড়া রোদে বাস

থেকে নেমে বাসার দিকে পা বাড়াতেই সে রাস্তার একবর্গ একব এলাকা জুড়ে ঘুটঘুটে জমাট অন্ধকার দেখতে পায়। সরলভাবে হাঁটতে হাঁটতে নিরীহ জন্মুরা যেমন গুপ্ত জালে জড়িয়ে পড়ে শিকারীর, সেও তেমনি আলোজ্বলা পথ দিয়ে কয়েক পা হাঁটার পরে হঠাত ওই অন্ধকার একরে প্রবেশ করে, এবং অসহায় অঙ্কের মতো চিংকার ক'রে ওঠে। তখনই তার সমস্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর অরূপ সুন্দর মুখমণ্ডল, যার ভয়াবহ সৌন্দর্যের পীড়নে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এ-ঘটনার পর এমন ঘটনার খবর আসতে থাকে শহরের নানা স্ট্রিট, দূর ধার্মের মাঠ ও নদী ও বিল থেকে। রাজধানির একটি নাট্যগৃহে ঘটে প্রায়-পরাবাস্তব এক ঘটনা। রাজধানির অলিতেগলিতে তখন নানা নাট্যিক নিরীক্ষা ও আন্দোলন চলছে; দেশের সমস্ত ব্যর্থ কবি নাটককেই উপযুক্তম মাধ্যম বিবেচনা ক'রে ব্যস্ত তখন নিরীক্ষায়। কেউ একটি থামের স্বগতোক্তির সাহায্যে প্রকাশ করছে সমকালীন সৌর ট্যাজেডি, কোনো গোত্র দর্শকে ঘর ভ'রে গেলে, দু-ঘণ্টার জন্যে মঞ্চের সামনে শক্তভাবে কালো যবনিকা ঝুলিয়ে দিয়ে পানাহারের জন্যে চলে যাচ্ছে কোনো হোটেলে; দর্শকেরা দু-ঘণ্টা ধ'রে কালো যবনিকা দেখে দেখে বিয়োগান্ত বিষাদে বুক ভ'রে বাড়ি ফিরছে; কোনো গোত্র মঞ্চে একটি লিঙ্গ স্থাপন ক'রে দেখাচ্ছে তার নানা রকম উৎসাহপতন। কিন্তু এ-নাট্যগৃহটিতে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হয় প্রথাগত নাটক, যা বিশ্঵য়কর কৌশলে রিকশাঅলা থেকে চৌকশ নাট্যসমালোচকদের চিত্তে অগরিমিত আনন্দ সঞ্চার করে। এখানকার নাটকে থাকে একজন মহান নায়ক, ও একটি দানবিক খলনায়ক, অর্থাৎ ভিলেন। প্রতিদিন নায়কের প্রতিষ্ঠা ও খলনায়কের বিনাশের মধ্য দিয়ে করতালিমুখরিত সমাপ্তি ঘটে নাটকের। কিন্তু ঘটনার দিন দর্শকেরা নায়কের বিরুদ্ধে ক্ষিণ হয়ে ওঠে। নায়ক যতোই মহত্ত্ব দেখাতে থাকে ততোই ক্ষেপে ওঠে দর্শকেরা; তার সমস্ত মহৎ ক্রিয়া ও আত্মাগতকে ঘেন্না করতে থাকে তারা; এবং এক সময় প্রচণ্ড প্রচণ্ডতর প্রচণ্ডতম হয়ে ওঠে। অন্য দিকে ভিলেনের জন্যে বাড়তে থাকে তাদের দরদ। ভিলেনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তারা উৎসাহউদ্দীপনা বোধ করতে থাকে; উল্লাসে অনেকে মারহাবা করে, কেউ টাকা ও ফুলের স্ববক ছুঁড়ে দেয়। ভিলেন যখন চাষীর বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছিলো, তখন আনন্দে ফেটে পড়ে কয়েকটি যুবক,—‘গুরু, গুরু’ ধ্বনি উঠতে থাকে তাদের কঠ থেকে; চাষীর তরুণী কন্যাকে ধর্ষণের সময় উল্লাসে শিংকার করে ওঠে কয়েকটি কিশোরীযুবতী। তারা বুকের কাপড় খুলে চিংকার করে,—‘প্রভু, আমাদেরও তুমি অমন করো।’ বুড়োরাও চরম উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। ভিলেনের ক্রিয়ায় চারদিকে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে; সম্মিলিত স্বরে দর্শকেরা চিংকার করে ‘ভিলেন তুমি অমর হও’ ‘ভিলেন আমরা তোমাকেই চাই’ ‘তুমিই মানুষের আণকর্তা’ ‘ভিলেন আমরা তোমার

দাস'। ভিলেনের পাষণ্ডতা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই বাড়তে থাকে আনন্দ উল্লাস করতালি শিশ। ভিলেন তাতে উৎসাহ আর প্রেরণা পেয়ে একআধটি ক্ষিপ্তবহুর্ভূত কাজ করতে থাকে, তাতে উল্লাস বাড়ে অনেক গুণে। কিন্তু এক সময় প্রথাসম্মত নাট্যকারের চক্রান্তে বা প্রতিক্রিয়াশীলতাবশত পরাজয় ঘটতে থাকে ভিলেনের চাষীরা দল বাঁধে, ধর্ষিতারা লজ্জা না পেয়ে নিষ্ঠুরভাবে এগিয়ে আসতে থাকে বল্লম নিয়ে, নায়কের সহযোগিতায় খানখান করতে থাকে ভিলেনকে। তাতে ব্যথিত হয়ে পড়ে দর্শকেরা; তাদের দরদী বুক থেকে বইতে থাকে কান্না, মুছিত হয় অনেক তরঙ্গী। প্রিয়তমের লোকান্তর বেদনায় তারা নাট্যগৃহকে শোকগৃহে পরিণত করে। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে নায়কের মঞ্চে প্রবেশের সাথে তারা শোক থেকে জেগে ওঠে। নায়কের প্রতিটি ভালো কাজ তাদের মনে জন্ম দেয় ঘৃণা আর ক্রোধ; তাকে তারা শনাক্ত করে প্রিয়ঘাতক হিশেবে, এবং হিংস্র হয়ে ওঠে নায়কের বিরুদ্ধে। কয়েকজন চিঢ়কার ক'রে মঞ্চ থেকে নায়ককে বেরিয়ে যেতে বলে; কিন্তু দর্শকের নির্দেশে তার প্রস্থান করা ঠিক হবে কিনা, তা স্থির করতে না পেরে সে সংলাপশ্বারকের নির্দেশ মতো সংলাপ ও নাট্যানুসারী ক্রিয়া ক'রে যেতে থাকে। তাতে দর্শকেরা হয় ক্ষিণ বাঘ; একদিকে তাদের হৎপিণ্ডে ভিলেনের মৃত্যুর শোক, অন্যদিকে নায়কের সৎক্রিয়া;—তারা আসন ছেড়ে মঞ্চের দিকে এগোতে থাকে। তিনি দিক থেকে তারা আক্রমণ চালায়; নায়ক পালানোর কথা ভুলে নিখুঁত অভিনয় করতে থাকে। সে সৎকাজে প্রবৃত্ত হতে চায়, কিন্তু দর্শকেরা বাধা দেয়। 'শালা, তোকে সহ্য করা অসম্ভব', ব'লে চিঢ়কার ক'রে কয়েকজন; 'তোর রক্ত চাই', ব'লে হংকার দেয় অনেকে। 'আমরা ভিলেন চাই' 'ভিলেনই আমাদের প্রভু', 'ভিলেনের সৃতি অমর হোক', 'ভিলেনের জন্যে আমরা চাল্লিশ বছর শোক পালন করবো' 'শালা, তোর মাংস চাই' প্রভৃতি শ্লোগান ওঠে। শ্লোগানে বিরক্ত বোধ করে কয়েকজন ক্রিয়ানুরক্ত দর্শক; কেউ পা কেউ হাত কেউ চুল ধ'রে নানা দিকে টানতে থাকে নায়ককে। কয়েকজনের হাতে ঝকঝক ক'রে ওঠে ছোরা। টেনে ছিঁড়ে ফেলে তারা নায়কের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; দিকে দিকে ছুঁড়ে দেয় হাত-পা-মাথা; একজন তার ছোরা দিয়ে তরমুজ টুকরোর মতো খুঁড়ে আনে নায়কের হৎপিণ্ড। নায়কের রক্ত তারা ছিটিয়ে দেয় একে অন্যের চোখমুখশরীরে; যুবতীরা পা ধোয় সে-রক্তে। হোলি খেলতে থাকে তারা নায়কের শরীর থেকে ফিনকি-দিয়ে-পড়া রক্তে। যখন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে সকলের শরীর, রঙিন হয়ে উঠেছে মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা, দূরের একফালি চাঁদ, তখন তারা সবাই হঁ হঁ কাঁদতে শুরু করে ভিলেনের শোকে। পাগলের মতো টুলতে টুলতে মৃচ্ছিত হয়ে পড়ে একে অন্যের গায়ে, মঞ্চে, টেবিলের নিচে, চেয়ারের ওপরে, দরোজার বাইরের গোলাপতলে। দেশের বিভিন্ন শহরে, ধামে, বাজারে লোকজন অত্যন্ত

উল্লাস বোধ করতে থাকে; কেননা তারা অনেকটা স্থির সিন্ধান্তে পৌছেতে পারে যে তিনি এসেছেন। বাজধানি থেকে পনেরো বগির একটি রেলগাড়ি যাচ্ছিলো দু-শো মাইল দূরের একটি শহরে। পথে একটা লম্বা ব্রিজ পড়ে। টেন ব্রিজে ওঠার সময় এপারে ওপারে জড়ো জনতা করতালি দিতে থাকে, কেননা ব্রিজের ওপাশের একশো গজ পরিমাণ জায়গা ভেঙে নদীতে ডুবে গেছে। জনতা এক অভূতপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো, যা কোনো চলচিত্রেও তারা দেখে নি। দুতগামী রেলগাড়িটি ব্রিজের ভাঙা অংশে পৌছোলে ভয়ে ড্রাইভার অচেতন হয়, এবং জনতা করতালি দেয়। প্রতিভাবান ফটোঘাফারের চলচিত্রের মতো তাদের চোখের সামনে একটির পর একটি বগি একটু তেরচাভঙ্গিতে আশ্চর্য শোভা ও মর্মস্পর্শী সুরে নদীতে ডুবে যেতে থাকে। ঘটনাটি ঘটার পরে অনেকেই আনন্দে বিহ্বল হয়ে জানায় যে এমন শোভাময় দৃশ্য তারা আর দেখে নি, কখনো শোনে নি এমন আবহসঙ্গীত। দর্শকদের অনেকেই এর পরে সমস্ত কাজ ভুলে চোখ বুঁজে দেখতে থাকে—নদীতে লাফিয়ে পড়ছে তেরচাভঙ্গিতে বগির পর বগি; একটি..

.দুটি...একশো...হাজার...লাখ... কাটি; অনন্তকাল ধ'রে অনন্ত বগি অনন্ত জলে শোভা ঢেলে হারিয়ে যাচ্ছে। এক ধামে এক পিতা গ্রামবাসীদের জড়ো করেছে তার উঠোনে। সকলের মধ্যে সে ঢোকে তার ফুলের মতো শিশুটিকে চুমো খেতে খেতে। বাঁ হাতে তুলে সে সবাইকে দেখায় তার তিন বছরের প্রফুল্ল কন্যাকে। সবাই যখন তার সৌন্দর্যে মুঝ্ব, প্রশংসায় ব্যাকুল, তখন পিতা কোমর থেকে টেনে বের করে শয়তানের মুখের মতো সুন্দর একটি ছোরা, ও বসিয়ে দেয় শিশুর বুকের মধ্যে। টগবগ হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে শিশুর সরল রক্ত, যাতে যারপরনাই তৃষ্ণি পায় সামাজিকগণ। একজন অসাধারণ পিতা তাদের মধ্যেই বাস করে জেনে ধন্য বোধ করে গ্রামবাসীগণ। গরিবরা দিনদিন বাড়ছে; যেমন অশ্বীল স্বাস্থ্য তাদের, তেমনি অশ্বীল তাদের আচরণ। তারা শহরে থুতু ছিটোয়, এখানে সেখানে হাণি করে তাদের ময়লা কুৎসিত বাচ্চারা, মাঝে মাঝে তারা ভীতিকরভাবে হানা দেয় ভদ্রদের দুঃস্পন্দে। এ-সমস্যা চমৎকারভাবে সমাধান করেন এক সেনাপতি, এবং পদোন্নত হন। একরাত্রে তিনি একটি বস্তি ঘেরাও ক'রে ধরে আনেন তাদের সবাইকে। গরিব দেশে মূল্যবান গুলি বা গ্যাস খরচ করা ঠিক' হবে না ভেবে তিনি ফাঁসি দিয়ে সমস্যা সমাধান করেন। শাসকগণ ও দেশবাসী এতে বড়ো আহাদিত হয়; অন্যান্য বস্তির লোকেরাও বেশ স্বষ্টি বোধ করে যে তাদের সমস্যা এতো সুন্দরভাবে সমাধান করতে পারেন তাদেরই মাটিতে জন্ম-পাওয়া কোনো সামরিক প্রতিভা। মেয়েদের নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হয়। একজন ধার্মিক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে মেয়েদের সব কিছুই অশ্বীল সম্মুখভাগ অশ্বীলভাবে উচ্চ, শরীর অশ্বীলভাবে বাঁক-খাদ-উপত্যকাভরপুর,

অর্থাৎ শ্বীলভাবে সমতল নয়, চাউনি অশ্বীলভাবে উত্তেজক, পেছনের অংশ অশ্বীলভাবে দ্বিবিভক্ত। এমন সর্বব্যাপক অশ্বীলতা সহনীয় নয়। তাই শ্বীলতা সৃষ্টির জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি তরঙ্গীকে বুকহীন পেছনহীন চোখহীন যোনিহীন ক'রে যেদিন প্রদর্শন করা হয়, সেদিন শ্বীলতার সমতল মৃত্তি দেখে সবাই নির্বাক হয়ে যায়। একজন কবি সবাক হয়ে প্রতিবাদ করলে তার শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। তখন সবাই বুঝতে পারে তিনি এসেছেন ওই নদী, ঠাণ্ডা রাত্রি, আর তারারাশি; দস্তা-কড়া দিন, ঝুলন্ত যাত্রী চাষী; ইঙ্গুলের শিশুরা, প্রতিটি রাইফেল ও সেনাপতি, রাজ্যপতি, শেফালির বিষণ্ণ বন, ছাত্ররা ও দাগী চোর ও খুনীরা—সবাই বুঝতে পারে তিনি এসেছেন। কেউ একজন রাস্তায় খুঁজে পায় তাঁর মুকুট থেকে খ'সে-পড়া মুক্তো, বাড়ির ছাদে কেউ খুঁজে পায় তাঁর হীরেখচিত জুতো, জামা থেকে ছিটকে পড়া বোতাম পায় কেউ, আর সবাই পায় তাঁর করুণা। আমোদ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, ‘তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন’; তাঁর করুণার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে থাকে জড় বস্তু আর প্রাণীরা। পাখির বুক থেকে, মানুষের মাংস থেকে, নদীর ঢেউ থেকে, বৃক্ষিকের বুক থেকে, তলোয়ারের ধার থেকে, জল্লাদের দড়ি থেকে, স্তব উঠতে থাকে: ‘তুমি এসেছো হে করুণাময় না প্রতিহিংসাময়, যে তুমি গোলাপের বুকে দাও নর্দমার কীটের উল্লাস, কুঠের মাংসে দাও শেফালির গোপন কামনা, বানাও বারুদ, ঘকঘকে করো ইস্পাত, তোমার করুণায় নদী হয় মরুভূমি, যুবতীর দেহে নামে পচাস্তোত, লাশের অভ্যন্তরে ঢোকাও যৌবন, ঘাতককে দাও সিংহাসন, প্রিয়তমকে ক'রে তোলো শক্ত, তোমার প্রশংসাই আমরা সন্ধ্যা সকাল সকাল সন্ধ্যা করি। আমাদের আর করণীয় নেই; আমরা তোমার পুজো করি। মহান শয়তান, প্রভু আমাদের, পালক আমাদের, তোমার করুণায় আমরা ধন্য।’

যাদুকরের মৃত্যু



সচিত্রকরণ রফিকুল নবী

আমাদের একমুঠো দেশটির মানচিত্রের দিকে তাকালে সেটিকে দোমড়ানো বুটের মতো মনে হয়। আগে এমন মনে হতো না; যে-দিন বর্বররা এলো, দখল করলো আমাদের দেশটি, সেদিন থেকেই এমন মনে হ'তে থাকে। আমাদের ছোটো,

চোখে-না-পড়ার মতো দেশটি যে পুরাণের কোনো সুখলোক ছিলো, বা ছিলো কোনো স্বর্গের টুকরো, তা নয়; তবে তাকে দোজখ বা নরকের সাথে তুলনা করাও ঠিক হতো না। দেশের প্রসঙ্গে অবশ্য একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস ছিলো আমাদের; বিশেষ করে দামি দুষ্পাপ্য ধাতুর সাথে দেশের মাটির তুলনা করা আমাদের দরিদ্র কৃষক থেকে গরিব কবিদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে পিয়েছিলো। একে আমরা গণ্য করতাম প্রেমিক বা পুত্রের স্বতন্ত্র অতিশয়োক্তি ব'লে। একটুও লজ্জা বা বিব্রত বোধ না ক'রে গ্রহের সবচেয়ে রূপসী দেশ ব'লে স্বব করতাম আমাদের দেশের, যদিও অনেকের খুবই ভালোভাবে জানা ছিলো যে এ-গ্রহে আমাদের দেশের থেকে রূপসী দেশ অনেক রয়েছে। আমাদের চাষীরা যদিও গান গাওয়ার অবসর খুব কমই পেতো, মাঠে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হতো তাদের, তবুও আমরা ভাবতাম যে গানে তাদের গলা পরিপূর্ণ। এক হাজার বছর ধ'রে যদিও আমাদের দেশে এক রকম অস্পষ্ট আকাল লেগেই ছিলো, বেশির ভাগ মানুষের মাস ও বছর যদিও কাটতো অনাহারে আধআহারে, তবুও আমরা ভালোবাসতাম গোলাভরা ধানের উপকথা বলতে ও শনতে। আমরা ভালো ছিলাম না, তবু বেশ ভালো ছিলাম; আমরা বেশ খারাপ ছিলাম, তবুও খারাপ ছিলাম না। একদিন বর্বররা এলো। সেদিন থেকে আমরা ভলোই ছিলাম, তবু ভালো ছিলাম না; সেদিন থেকে আমরা খারাপ ছিলাম না, তবুও খারাপ ছিলাম। বর্বররা আসার পর আমরা পুরোপুরি বদলে গেলাম। প্রথমে দেশকে, যে-দেশকে আমরা গ'ড়ে তুলেছিলাম নানান রঙের অতিশয়োক্তিতে, সে-দেশ আমাদের চোখে দেখাতে লাগলো দোমড়ানো বুটের মতো কদাকার। দেশের স্বব করার যে-অভ্যাস আমাদের ঐতিহাসিক স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো, তার থেকে আমরা হঠাতে মুক্তি পেয়ে গেলাম। বর্বররা আসার পর থেকে সোনার সাথে দেশের মাটির তুলনা আর কেউ করে নি; তাকে খুব রূপসী ব'লেও দাবি করে নি কেউ। লজ্জায় যে আমার অমন তুলনা থেকে বিরত হয়েছিলাম, তা নয়; অমন তুলনার কথা মনেই হয় নি কারো। অসুখ হ'লে মানুষের যেমন বদল ঘটে, যেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ, বা মানুষ মরণের দিকে এগোতে থাকলে যেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে চোখের তারা, তেমন বদলের ছোয়া লাগে আমাদের সব কিছুতে। সবুজ রঙটি আমরা পছন্দ করতাম। আমাদের গাছপালায় ওই রঙটি বেশ ভেজা ভেজা রকমের ছিলো, ছুঁলেই আঙুলে রঙ লেগে যাবে ব'লে মনে হতো; সেই ভেজা সবুজ রঙ, বর্বররা আসার পর, কালচে হয়ে উঠতে থাকে। বহু পুরুর ছিলো আমাদের দেশে। পুরুরে পানি, আর ওই পানিতে পাবদা, ট্যাংরা, নলা, বোয়াল, কাতল, চিতল, ঝুঁই ও আরো অনেক ধরনের মাছের বসবাসকে আমরা সুনিশ্চিত প্রাকৃতিক সত্ত্ব ব'লে মনে করতাম; কিন্তু ওই পানি, বর্বররা আসার পর, শুকিয়ে যেতে থাকে;

এবং খুব পরিচিত মাছগুলো কীভাবে যেনো মিশে যেতে থাকে পুকুরের শুকনো মাটিতে। আগে যেখানেসেখানে ডুব দিয়ে শরীরটিকে ঠাণ্ডা ক'রে নেয়া যেতো, চাষীরা ও দূরের পথিকেরা সাধারণত তাই করতো; কিন্তু বর্বররা আসার পর আমাদের পুকুরের পানিতে আর গা ডোবে না, এমনকি খাওয়ার পানিও দুপ্পাপ্য হয়ে ওঠে। নদী ছিলো আমাদের দেশের আনন্দ ও দুঃখ দুই-ই। সে-নদীতে চর পড়তে লাগলো। যে-নদী আগে কয়েক ক্রোশ চওড়া ছিলো, বর্বররা আসার পর, চর প'ড়ে সে-নদী খালের মতো রোগা হয়ে উঠলো। স্বাস্থ্যবতী নারী আমাদের পছন্দ ছিলো। গুরু পশ্চাদেশ ও স্থূল উচ্চ বক্ষদেশসম্পন্ন নারী আমাদের বাসনাকে আলোড়িত করতো, কিন্তু বর্বররা আসার পর আমাদের নারীরা কাঠের মতো শুক্ষ হয়ে উঠতে লাগলো। স্বামী ও সন্তান ও প্রেমিক কাউকেই পরিত্পত্তি করার মতো সম্পদ তাদের রইলো না।

www.boighar.com

আমাদের ঘরবাড়িগুলোকে যেনো অসুখে ধরলো। আগে ঘরের চাল, চালের ওপর খেজুরগাছের ডালপালা, জাঙ্গায় লাউকুমড়োর ডগা, শিমের নীল ফুল, বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া মেঠোপথ দেখলে বুক খুশিতে বিলিক দিয়ে উঠতো; কিন্তু বর্বররা আসার পর খুশি জিনিশটিই অচেনা হয়ে গেলো। উঠোন গোবর দিয়ে দিনে দশবার লেপলেও আগের মতো ঝকঝক করতো না, একবার ভিজলে শুকোতে চাইতো না; ওই উঠোনে লাল লংকা, ধান বা অন্য কোনো শস্য শুকোতে দিলে বেলা প'ড়ে গেলেও তা শুকিয়ে আগের মতো ঝকমকে হয়ে উঠতো না। আগে শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় নানান শজি ও ফলে আমাদের উঠোন ও খেত ভ'রে উঠতো। জাঙ্গায় সবুজ লাউডগা ও ঝুলন্ত গোলাকার বা দীঘল লাউ আগে স্বাভাবিক দৃশ্য ছিলো, যেমন ছিলো ঘরের পাশেই ঝুলন্ত কুমড়ো, লাল হয়ে যাওয়া ডালিম, যুবতীর আঙুলের মতো ঢেঁড়স, পুইশাকের দৃশ্য। বর্বররা আসার পর এসব দুর্লভ হয়ে ওঠে। বন্ধুকে দেখে আগে বিলিক দিয়ে উঠতো চোখ, মেহাস্পদ কাউকে দেখলে বুকে একরকম প্রীতির আলোড়ন অনুভব করতাম আমরা; কিন্তু আমাদের শরীর, বর্বররা আসার পর, এসব সংবেদনশীলতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায়। কারো মুখের রঙই আর স্বাভাবিক ছিলো না। রঙ চটে সকলেরই চোখেমুখে একটা বিরম ভাব এসে গিয়েছিলো। ফুসফুস, মগজ, হৎপিণ্ড চোখে দেখা যায় না ব'লে ওসবের অবস্থা কেমন হয়েছিলো জানি না, তবে আমাদের রক্তের রঙ যে বদলে গিয়েছিলো, তা আমরা প্রায়-সবাই দেখেছি। খোঁচা লাগলে শরীর থেকে ময়লা রঙ বেরোতো; এতো ময়লা যে আগে হ'লে খুবই ঘেন্না লাগতো; কিন্তু বর্বররা আসার পর ঘেন্নাবোধও আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো ব'লে ওই রক্ত দেখে কারো বমি পেতো না। অনেক দিন আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি নি। আগে দিবাস্পন্ন দেখেই আমাদের দিনের অর্ধেক কাটতো,

কিন্তু বর্বররা আসার পর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাও আমাদের স্থগিত হয়ে যায়। আমাদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এমন শৃঙ্খলা চোখে কোনো স্বপ্ন জন্ম নিতে পারে না; আর দিবাস্বপ্ন দেখার জন্যে দরকার যে-কল্পনাশক্তি, প্রয়োজন যে-কামনা, তা আমাদের বুক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। যুবকেরা স্বপ্ন দেখতো না, বুড়োরাও মনে করতে পারতো না কোনো স্বপ্নের স্মৃতি। নারীদের আমরা অনেক দিন আদর করি নি; শিশুদের আমরা অনেক দিন বুকে জড়িয়ে ধরি নি। বর্বররা আসার পর কয়েক মুহূর্তের অধিককাল নারীসংসর্গ সহ্য করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে আমাদের পক্ষে; এবং শিশুদের গালে চিবুক ছেঁয়াতেও আমরা পীড়িত বোধ করতে থাকি। শস্যক্ষেত্রে, বর্বররা আসার পর, মারাঞ্জক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাকা ধান কাটতে গিয়ে চাষীরা দেখে শস্যকণায় পচন ধরেছে; অনেক ধানের দুধ শক্ত না হয়ে ঘোলা হলদে হয়ে গেছে। সরষে, তিল, কাউনের মতো ফসল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে; কোনো খেতেই এসব শস্যের বীজ ফেললে অঙ্কুরিত হয় না। চারপাশে দেখা যায় আগাছার পুলকিত উদগম। আগে এসব আগাছা ছিলো না। কিছু আগাছা এক পশলা বৃষ্টিতেই উদগত হ'তে থাকে, এবং দিনসাতকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সারা এলাকায়। কিছু আগাছা জন্ম নেয় অনাবৃষ্টিতে;-দিন কয়েক রোদ হ'লেই অসংখ্য কাঁটা নিয়ে মাটির নিচ থেকে রাঙ্কসের মতো মাথা তোলে একধরনের আগাছা, যার আক্রোশে ফসল তো বাঁচতেই পারে না, এমনকি চাষীদের হাত-পা-শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্ষতে দ্রুত পুঁজের আবির্ভাব ঘটে।

বর্বররা আসার পর কিছু কথা পুনরাবৃত্ত হ'তে থাকে আমাদের দেশ জুড়ে। বাইরের কেউ শুনলে মনে করতে পারতো যে আমরা কারো কাছে এসব শুনে শিশুর মতো মুখস্থ করেছি; আর পথেঘাটে, বাজারে, চায়ের দোকানে যখন একে অপরের মুখোমুখি হই তখন মুখস্থ কথাগুলোই বারবার বলি। মনে করতে পারতো যে আমাদের ভাষার শব্দভাষার খুবই দরিদ্র, আর বাক্যও মুষ্টিমেয়। আসলে এসব কথা আমরা মুখস্থ করি নি; একে অপরের সাথে দেখা হ'লে ভেতর থেকে ওই কথাগুলোই বেরিয়ে আসতো, নতুন কিছু বলার উৎসাহও জাগতো না। কেউ হয়তো বলতো, ‘নদীতে চর পড়েছে’, এর উত্তরে শ্রোতা হয়তো বলতো, ‘মাঠে আজকাল বাঁশি বাজে না।’ ‘নদীতে চর পড়েছে’র উত্তর যে ‘মাঠে আজকাল বাঁশি বাজে না’ হয় না, তাও আমরা বুঝে উঠতে পারতাম না, যদিও একসময়, বর্বররা আসার আগে, তা আমরা ভালোভাবেই বুঝতাম। কেউ হয়তো বলতো, ‘অনেক দিন স্বপ্ন দেখি নি’, এর উত্তরে শ্রোতা হয়তো বলতো, ‘মেয়েদের বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।’ তরঁণেরা অবশ্য ‘স্বপ্ন কাকে বলে’ ধরনের কথা বলতেই অভ্যন্তর হয়ে পড়েছিলো; কেননা তারা কখনো স্বপ্ন দেখে নি। বয়ক্ষরা, যারা অনেক আগে স্বপ্ন

দেখেছিলো, স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা আছে ব'লে যারা গৌরব বোধ করতো, তারাও স্বপ্ন ব্যাপারটি বোঝাতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তো। ঠিক বুবিয়ে উঠতে পারতো না স্বপ্ন জিনিশটি কী; এমনকি তারা ঠিক মতো মনেও করতে পারতো না তাদের অনেক-দিন-আগে-দেখা স্বপ্ন। ‘অনেক দিন মেলায় যাই নি’ হয়তো কেউ বলতো; উভয়ে শ্রোতা হয়তো বলতো, ‘বৃষ্টির কি কোনো সম্ভাবনা আছে?’ এমন সব কথা, বর্বররা আসার পর, শোনা যেতো আমাদের দেশে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম স্বপ্ন দেখতে; নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো আমাদের সব স্বপ্ন। আশা ব'লে একটা জিনিশ আগে ছিলো আমাদের, বর্বররা আসার পর তা পুরোপুরি লোপ পায়। নতুন জামা পরলে যে-আনন্দ লাগে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হই; এমনকি আমাদের শিশুরাও নতুন জামা প'রে উল্লাস বোধ করে না। বর্বররা আসার পর কখনো মনে হয় নি যে যুবতীদের ধীবার বা সম্মুখভাগের দিকে একবার তাকাই; কখনো মনে হয় নি যে একটু রাত বেশি জেগে থেকে একা একা গান গাই, পুরোনো সুর মনে ক'রে বুকটাকে ভিজিয়ে তুলি, বা নতুন সুর গুণগুণ ক'রে বুকে কামড় খাই। বর্বররা আসার পর কখনো মনে হয় নি যে একবার পান ক'রে মত হই, বা গভীর কিছু ভেবে ধ্যানস্থ হই; ইচ্ছে হয় নি যে একটু পাপ করি বা সাধ হয় নি যে একটু পুণ্য জমাই অন্য কোনো কালের জন্যে; মনে হয় নি যে-পথে হাঁটি নি সে-পথে একবার হেঁটে আসি, বা যেখানে কোনো পথ নেই সেখানে একটা নতুন রাস্তা বানাই। বর্বররা আসার পর আমরা ম'রেও যাই নি, বেঁচেও থাকি নি; বর্বররা আসার পর আমরা বেঁচেও থাকি নি, আবার ম'রেও যাই নি।

এমন সময় এমন অবস্থায় সেই যাদুকর আসে। কোথা থেকে এসেছিলো আমরা জানি না। তার যাদু আমাদের এতো মুঝে করেছিলো যে আমরা সবাই বলাবলি করতাম যাদুকর এসেছে আকাশের নীল দরোজা খুলে; কারো মতে মাটির নিচে একটা সোনার জগত আছে সেখান থেকে; কারো মতে সমুদ্রের ভেতর থেকে এসেছিলো। আমরা, বর্বররা আসার পর, মুঝে হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম; হারিয়ে ফেলেছিলাম রহস্য দ্বারা আলোড়িত হওয়ার ক্ষমতা। যাদুকর আমাদের ফিরিয়ে দেয় সেই শক্তি;—মুঝে হওয়ার রহস্য অনুভব করার অলৌকিক শক্তি। জোয়ারের সাথেই তার তুলনা করা চলে। একটা জোয়ার আসে আমাদের বিমর্শ জীবনে। যাদুকরকে আমরা কেউ কাছে থেকে দেখি নি, তাই তার মুখটি দেখতে কেমন ছিলো, বা চোখের রঙ কী ছিলো, বা চুলে তার কী রকম ঢেউ খেলতো, তা আমরা কেউ ঠিক মতো বলতে পারবো না। সে কাছে এলেও তাকে মনে হতো খুব দূরে; আবার দূরে থাকলেও মনে হতো বুকের কাছে। সে যখন হাসতো মনে হতো তার হাসিটি একেবারে আমার মুখের ওপর বা আমি নিজেই যেনো যাদুকর হয়ে হাসছি; পরমহৃত্তেই মনে হতো আকাশে ছড়িয়ে

পড়েছে সে, তার হাসিটি ভাসছে চাঁদের একপাশে বা মেঘের তেতর। যাদুকর আমাদের কাছে ছিলো শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজালের মতো। তার মুখের দিকে তাকালে আমরা তার মুখে বর্বররা আসার আগে আমাদের পুরুরের টলটলে পানি, চেউ, মাছের ঘাঁই দেখতে পেতাম; দেখতাম তার মুকুটে ঝকঝক ক'রে উঠেছে আমাদের অনেক আগের দিনের উঠোন; নদী বয়ে চলছে শাঁইশাঁই ক'রে; একঝাঁক ইলিশ ঢেউয়ের তেতর দিয়ে ছুটে চলছে উজানে। তাকে দেখাই আমাদের চোখে ছিলো যাদু দেখা। তার হাতের লাঠির দিকে তাকিয়ে বুড়োরা বলতো যে স্বপ্ন অনেকটা ওই লাঠির রহস্যময় আন্দোলনের মতো ছিলো। সেই যাদুকর আমাদের গরিব পাড়াগাঁয়ে, বিষণ্ণ শহরে, উশকোখুশকো মাঠে, বিবর্ণ বনে বনে যাদু দেখাতে লাগলো। সাড়া প'ড়ে গেলো দেশ জুড়ে। তার যাদুতে খিলিক দিয়ে উঠতো রহস্য ও বিশ্বয়, শোভা ও স্বপ্ন ও আরো অনেক কিছু; আর আমরা ব্যাকুল বালকের মতো দাঁড়িয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখতাম তার যাদু। সে এ-মুহূর্তে হয়তো যাদু দেখাতো এক শহরে; পরমুহূর্তেই যাদু দেখাতো অন্য কোনো শহরে; অনেক সময় সে একই সময় যাদু দেখাতো নানা শহরে বা ধামে। যাদুকরেরা সাধারণত কোনো তাঁবুতে বা প্রেক্ষাগারে পরিকল্পিত পরিবেশের মধ্যে যাদু দেখিয়ে থাকে; কিন্তু সেই যাদুকর তাঁবুতে বা প্রেক্ষাগারে যাদু দেখাতো না। কখনো সে যাদু দেখাতে শুরু করতো চৌরাস্তায়; একে একে মানুষ জমতো, www.boighar.com এক সময় রাস্তা উপচে পড়তো অভিভূত অসংখ্য মানুষে। মনে হতো রাস্তাঘাট, চারপাশের ঘরবাড়ি, যানবাহন অভিভূত হয়ে পড়েছে যাদুতে; তারা চ'লে গেছে কোনো স্বপ্নপূরীতে, যেখান থেকে তারা কোনো হারানো ধন মুখে ক'রে উঠে আসবে বাস্তবে। কখনো সে গ্রামের মেঠোপথে শুরু করতো খেলা দেখাতে। মাঠের কোনো রাখালের চোখে হয়তো প্রথম পড়তো সে; রাখাল যাদু দেখার জন্যে এগিয়ে আসতো তার দিকে, তারপর ধান, তরমুজ, সরষে, শজি ক্ষেত থেকে আসতো চাষীরা। তারা দেখতো যাদুকরের লাঠির হৌঁয়ায় আকাশ থেকে নেমে আসছে বিশাল তরমুজ; ওই দিকে পেকে উঠেছে আমন ধান; নদী বয়ে চলছে গর্জন ক'রে; নৌকা ছুটে চলেছে; জাংলায় ঝুলছে লাউ; মাটির ওপর পেকে উঠেছে মিষ্টি কুমড়ো। তার যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো চারপাশ;—চাষীরা, চাষীবউরা, মাঠের পশুরা। কিছুক্ষণ পর যখন যাদুর রেশ কেটে যেতো, তাদের চোখেমুখে লেগে থাকতো এক আশ্চর্য অতীতের চুমোর দাগ, না-দেখা ভবিষ্যতের সোনালি রঙ।

বহু দিন পর, বর্বররা আসার পর, সেই প্রথম আবার জীবন ফিরে এসেছে আমাদের জীবনে। যাদুকর যা সৃষ্টি করতো তা সত্য ছিলো না, কিন্তু আমাদের কাছে ছিলো সত্যের থেকেও সত্য। যাদুকর গর্জনশীল নদী বইয়ে দিতো আকাশে, সে-নদী সত্য ছিলো না; তার লাঠির আন্দোলনে ফুটে ওঠা ফুল, ফলে ওঠা ফল

সত্য ছিলো না; কিন্তু আমাদের কাছে ছিলো সত্য। আমরা ওই নদীতে ডুব দিতাম, ওই ফুলের গন্ধে আমাদের নাসিকা ও রক্তকণিকা ভ'রে উঠতো; ওই সব ফলের স্বাদে আমাদের জিভ সুখী হতো। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা হয়ে উঠতাম আমরা। যাদুকর আসার পর, তার রহস্যময় যাদু দেখার পর, অনেকেই আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করে। স্বপ্ন দেখার প্রথম ভাগ্য হয়েছিলো এক চাষীর। সে স্বপ্ন দেখে যে তার রোগা গাভীটি একটি স্বাস্থ্যবান এঁড়ে বাচুর প্রসব করেছে; আর তার আঙুলের ছেঁয়ায় গাভীর বাঁট থেকে চারটি শুভ শিখার মতো নেমে আসছে দুধের ধারা। স্বপ্ন দেখেই সে উল্লিখিত হয়ে ওঠে; পাশে শোয়া অসুস্থ স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে স্বপ্নের কথা বলে। স্ত্রী প্রথমে বুঝতেই পারে না তার স্বামী কী বলছে; তবে কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটি তারও পুরোপুরি অবোধ্য থাকে না। স্ত্রী তার স্বামীকে জানায় যে-গাভীর কথা তার স্বামী বলছে, সেটি অনেক আগেই মারা গেছে। এতে স্বামীটি দৃঢ়ীভিত না হয়ে খুশি হয়ে ওঠে; কেননা যে-গাভী তার একদিন ছিলো, যা এখন আর নেই, সে-গাভীটিকে সে দেখতে পেয়েছে। যে-গাভীটি তার বুক জুড়ে ছিলো কিন্তু কোথাও ছিলো না, যাকে দেখার জন্যে তার রক্তে পিপাসা ছিলো, তাকে সে দেখতে পেয়েছে। স্বপ্নের ঘটনাটি পরের সকালেই আগন্তনের শিখার মতো দিকে দিকে ছাড়িয়ে পড়ে। দিকে দিকে লোকজন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পথের পাশে ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে ঘুমিয়ে ছিলো এক ভিখিরি; সে দেখতে পায় এক আশ্চর্য স্বপ্ন। বস্তিতে ছেঁড়া চটের ওপর শুয়ে ছিলো এক ক্লান্ত শ্রমিক; সে এক স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠে। শহরের মধ্যবিস্ত বাড়িতে এক যুবক সারা রাত ঘুমোতে না পেরে তোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে; কিছু পরেই একটা ঝঁইমাছ স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে। এক বুড়ো অনেক দিন ঘুমোতে পারছিলো না, সন্ধ্যায় যাদুকরের যাদু দেখে ঘুমিয়ে পড়ে; মাঝরাতে সে স্বপ্ন দেখে যে বনের মধ্যে কাঁদছে একটি হরিণ। এক কিশোরী স্বপ্ন দেখে যে আকাশে নীল চাঁদ উঠেছে। এক যুবতী স্বপ্ন দেখে যে সোনারঙ্গে একটি ঘোড়া বিছানায় তার পাশে ঘুমিয়ে আছে। দিকে দিকে ঘটতে থাকে বিচ্ছিন্ন স্বপ্নের ঘটনা; আর স্বপ্নই হয়ে ওঠে আমাদের বাস্তব। বর্বররা আসার পর আমরা কোনো স্বপ্ন দেখি নি; অজানালোক থেকে যাদুকর আসার পর আবার আমরা স্বপ্ন দেখতে থাকি।

যাদুকরের কিছু যাদু আমাদের কাছে লাগতো মধুর; তাতে আমরা বাঁশির সূর শুনতাম। পচনলাগা ধানখেতের আলে দাঁড়িয়ে সে দেখাতো তার আঙুলে গজিয়ে উঠেছে ধানের ছড়া; তাতে ঝিকমিক করছে পাকা ধান। আমরা দৌড়ে গিয়ে তার হাত থেকে ছড়াগুলো নিয়ে ধান খুঁটে বের করতাম পুষ্ট শাঁস। কোনো শাঁসেই পচন লাগে নি। একের পর এক, অনবরত, ধানের ছড়া গজাতো তার দু-হাতের আঙুলে। বিচ্ছিন্ন ধরনের ধান সব; সব ধানের নামও আমাদের জানা ছিলো না।

যাদুকর আমাদের জানাতো অনেক আগে ওই সব ধান ফলতো আমাদের জমিতে; যে-ধানগুচ্ছ থেকে সুবাস বেরিয়ে আসছে, তার প্রচুর ফলন হতো পাশের খেতে; আর মুক্তির মতো যে-ধানগুলো, তার কাপে এক সময় ঝলমল ক'রে উঠতো বিলের পর বিল। একটি শুকনো আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে যাদুকর; আমরা অপেক্ষায় আছি; আর অমনি গাছটির দিকে তাকিয়ে দেখি লাল লাল পাতা গজিয়ে উঠছে গাছে, সবুজ হয়ে উঠছে পাতাগুলো, বাতাসে কাঁপছে। বোল ধরছে ডালে ডালে, আমাদের চোখ ত'রে যাচ্ছে হলদে বোলের রঙে। যাদুকর চ'লে যাওয়ার পর গাছটি আবার পরিণত হতো শুকনো গাছে; কিন্তু আমরা ওই গাছের দিকে তাকিয়েই বিভোর হয়ে থাকতাম। দীর্ঘশ্বাসে বুক ফুলে উঠতো।

আমাদের ছোটো দেশটিতে বর্বররা আসার পর যেখানে কোনো স্বপ্ন ছিলো না, সেখানে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে; যেখানে কোনো গান ছিলো না, গান গাওয়া শুরু হয়েছে; যেখানে কোনো শৃতি ছিলো না, সেখানে শৃতি জেগে উঠতে শুরু করেছে। যাদুকরের মধুর যাদু তখন আমাদের আলোড়িত করছে, জাগিয়ে তুলছে। যাদুকর একদিন আমাদের দেখালো এমন ভয়নক যাদু, যা আমরা আশা করি নি। চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখে তার অন্য রকম রহস্য। ভিড় জমতে শুরু করেছে। নতুন কোনো রহস্য দেখার জন্যে অন্য রকম হয়ে উঠেছে সকলের চোখমুখ। কিন্তু অন্ন পরেই এক ভয়ঙ্কর যাদু দেখে আমরা সবাই আর্তনাদ ক'রে উঠলাম। যাদুকর তার দু-হাত উঁচিয়ে দেখালো তার হাত বনের পাখির মতোই মুক্ত; কিন্তু পরমহৃতেই সবাই দেখলাম তার হাত দুটি শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খলিত হাত দেখে বুক থেকে আমাদের অজ্ঞাতে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। যাদুকরের ওই হাতে, বিদ্যুৎশিখার মতো ওই হাতে, কেউ শেকল দেখার কথা ভাবতেও পারে নি। তার এতো দিনের যাদুগুলোর মধ্যে এটাই যেনো সবচেয়ে অভাবিত। যাদুকর লাফিয়ে তার মুক্ত পা দুটি দেখালো। একটু পরেই সবাই দেখলাম তার পা দুটিও শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খলিত যাদুকর চৌরাস্তায় লুটিয়ে পড়লো। সবাই চিংকার ক'রে যাদুকরের দিকে ছুটতে যাচ্ছিলো; কিন্তু সবাই দেখলো তাদের পা শৃঙ্খলিত; ওপরের দিকে হাত তুলে চিংকার করতে গিয়ে সবাই দেখলো তাদের সকলের হাতই শৃঙ্খলিত; শরীর শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খলিত অবস্থায় চৌরাস্তায়, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম থেকে আসা রাস্তায় তারা প'ড়ে রইলো। তখন যারা ওখানে ছিলো না, তারাও হঠাত কাঢ় আঁঘাতে চমকে উঠলো। মাঠে চাষ করছিলো চাষী; হঠাত তাদের হাত থেকে লাঙল খ'সে পড়লো; তারা দেখলো তাদের হাতে শেকল, এগোতে গিয়ে দেখলো পায়ে শেকল। মাঝি নৌকো বেয়ে চলছিলো নদী দিয়ে, হঠাত হাত থেকে বৈঠা খ'সে পড়লো; তারা দেখলো তাদের হাতে শেকল, পায়ে শেকল। মজুররা কাজ করছিলো ইটখোলায়; তাদের মাথা থেকে ইটের

বোৰা প'ড়ে গেলো; তারা দেখলো তাদের হাতে শেকল, পায়ে শেকল। শ্রমিকরা দেখলো তাদের হাতে শেকল, পায়ে শেকল। শিশুরা পাঠশালায় অ-তে অজগর, আ-তে আম ব'লে পাঠ মুখস্থ করছিলো; তারা হঠাত দেখলো তাদের হাতেপায়ে অজগরের মতো শেকল উঠেছে। শেকলের ভাবে তারা বেঞ্চ থেকে লুটিয়ে পড়লো। সব ধরনের বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা দেখলো তাদের হাতে শৃঙ্খল, পায়ে শৃঙ্খল। বিভিন্ন কর্মস্থলে কাজ করছিলো যারা, তারা হঠাত দেখলো কলম খ'সে পড়েছে হাত থেকে, আর ওই হাতে শেকল; পা নাড়তে গিয়ে দেখলো পায়ে শৃঙ্খল। আকাশে উড়ে যাচ্ছিলো বক, বালিহাঁস; ডালে বসেছিলো দোয়েল, ময়না; হঠাত পাখিদের ডানা জড়িয়ে পড়লো শেকলে; আর তারা উড়াল থেকে, ডালে বসা থেকে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। একটি কোকিল গান ধরেছিলো; তার গলায় শেকল এতো শক্ত হয়ে জড়ালো যে গানের বদলে তার গলা থেকে বক্ত ঝরতে লাগলো। আমরা আমাদের ছোটো দেশের ছোটো আকাশে একটি বড়ো শৃঙ্খল ঝুলতে দেখলাম আকাশে মেঘেরা শৃঙ্খলিত; কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যের আলো ক'মে এলো, দেখলাম আমাদের সূর্যকে ঘিরে একটা শৃঙ্খল।

ওই শৃঙ্খলিত অবস্থা বেশিক্ষণ ছিলো না, কয়েক মুহূর্তেই যাদুকর বিদ্যুতের মতো হাত-পা নাড়লো; তার শৃঙ্খল হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। যাদুকর নতুন ধরনের রহস্যময় হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চৌরাস্তায়, নানান রাস্তায়, দেশ জুড়ে, চাষী, মাঝি, মজুর, শ্রমিক, বিদ্যার্থী, নারী, পুরুষ, পাখি ও প্রাণীর হাত-পা-শরীর থেকেও খ'সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো শৃঙ্খল। যে যার পথে চ'লে গেলো, কিন্তু সকলের হাতপায়ে লেগে রইলো অদৃশ্য শেকলের দাগ; যে যার কাজে নিবিষ্ট হলো, কিন্তু সকলের হাতে পায়ে ঝুলে রইলো একটা অদৃশ্য শেকলের ভাব। এরপর আমরা সবাই হাতে পায়ে শরীরে একটা ভার বইতে লাগলাম। একটু অন্যমনঞ্চ হ'লেই মনে হতো শেকলটা যেনো শক্ত হয়ে উঠেছে, হাতপা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। শব্দও শুনতে পেতাম শেকলের। কিছু দিনের জন্যে যাদুকর অদৃশ্য হয়ে গেলো; তাকে কোথাও দেখতে পাই না। কিন্তু তার কথা মনে হ'লেই শেকলটাকে পাই। বাজারে যাচ্ছি, যেই একটু আনমনা হয়েছি, অমনি টের পাই হাতে শেকল; পা ফেলতে যাচ্ছি, কেমন অসুবিধা লাগছে, টের পাই পায়ে শেকল। চাষীরা চাষ করছে, মনে হচ্ছে পা আর চলছে না; তাকিয়ে দেখে পায়ে শেকল; ধান কাটছে, হাত চলছে না; তাকিয়ে দেখে হাতে শেকল। পরমুহূর্তেই নেই। বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকেরা বিদ্যার্চার্য রত, হঠাত দেখতে পায় হাতেপায়ে শেকল; আবার নেই। জেলে, মাঝি, শ্রমিক কাজ করছে, টের পায় হাতেপায়ে শেকল ঝুলছে; আবার নেই। শয়্যায় নারীকে কাছে টানতে গিয়ে মনে হয় শেকলে বাঁধা প'ড়ে আছি; তাকে কাছে টানতে পারছি না। প্রেমিক নির্জনে প্রেমিকাকে

জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখে হাত শৃঙ্খলিত; সে জড়িয়ে ধরতে পারছে না; চুমো থেতে গিয়ে টের পায় তার ওষ্ঠও শৃঙ্খলিত। সে-দিনের যাদুর পর মুহর্মহ আমরা হাতে পায়ে একটা অদৃশ্য শেকল অনুভব করতে লাগলাম; বইতে লাগলাম একটি ভারী ভয়াবহ শেকলের ভার। একে অন্যের সাথে দেখা হ'লেই আমরা শুধু শেকলের কথা বলতাম।

আমরা যখন আমাদের অদৃশ্য শেকল নিয়ে ব্যস্ত, শৃঙ্খল যখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠেছে, তখন একদিন আবার চৌরাস্তায় দেখা গেলো যাদুকরকে। তার চারদিকে জমতে লাগলাম আমরা। তার মুখে অন্য ধরনের হাসি; আর আমাদের চোখমুখেও এমন এক অচেনা অভিব্যক্তি, যা আগে আমাদের, বর্বররা আসার পর, কখনো ছিলো না। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্থিত বোধ করছিলাম; ভাবছিলাম আমাদের মুখে কী ক'রে এলো ওই অভিব্যক্তি, আর ওই অভিব্যক্তির তৎপর্যই বা কী? যা আমরা বুঝতে পারছিলাম না অথচ যা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো আমাদের অবয়ব থেকে, তা হয়তো বুঝতে পারছিলো যাদুকর। এমনও হ'তে পারে যে আমাদের চোখমুখের ওই অভিব্যক্তি ও ছিলো অজানা থেকে আসা যাদুকরেরই যাদু। এবার সে যে-যাদু দেখালো, তা আরো অভাবিত ও উল্লাসজনক। যাদুকর আমাদের তার পায়ের দিকে তাকাতে বললো; আমরা দেখলাম তার বিদ্যুতের মতো পায়ে শৃঙ্খল। আমাদের সে তার হাতের দিকে তাকাতে বললো; আমরা দেখলাম তার বিদ্যুতের মতো হাতে শৃঙ্খল। তারপর যাদুকর তার শৃঙ্খলিত বিদ্যুতের মতো হাত মাথার ওপর উঠিয়ে যেই মোচড় দিলো, অমনি ঝনঝন ক'রে খানখান হয়ে গেলো অজগরের মতো শৃঙ্খল। আমরাও তার সাথে সাথে মাথার ওপর আমাদের হাত তুলে মোচড় দিতেই টুকরোটুকরো হয়ে গেলো আমাদের হাতের শেকল। যাদুকর লাখি দিতেই তার বিদ্যুতের মতো পায়ের শৃঙ্খল ঝনঝন ক'রে খানখান হয়ে গেলো। আমরাও তার সাথে সাথে লাখি ছুঁড়লাম, ঝনঝন ক'রে টুকরোটুকরো হয়ে গেলো আমাদের পায়ের শেকল। চৌরাস্তায়, পথে পথে, মাঠে মাঠে, বাজারে বাজারে, সব বিদ্যালয়ে, নদীতে নদীতে, ধানখেতে, কারখানায় বাজতে লাগলো শৃঙ্খল চুরমার হওয়ার শব্দ। www.boighar.com আমরা বারবার হাত উঠিয়ে মোচড় দিতে লাগলাম, লাখি ছুঁড়তে লাগলাম, আর এক অভিনব বাদ্যঘংকারের মতো বাজতে লাগলো শেকল চুরমার হওয়ার শব্দ। অমন মধুর, মহান, শিরৱহস্যময় ধ্বনি আগে আমরা কখনো শুনি নি। আমাদের ছোটো দেশটি ভ'রে সমুদ্রের গর্জনের মতো, বাদ্যসমবায়ের ঘংকারের মতো সেই

শেকলভাঙ্গার ধ্বনির চেউ উঠতে লাগলো। আমাদের হাতপা ভারহীন হয়ে উঠলো। বর্বররা আসার পর এমন নির্ভার আমরা কখনো বোধ করি নি।

পরদিনই যাদুকরের লাশ পাওয়া গেলো শহরের চৌরাস্তায়। বর্বরদের একটি বিশাল ছুরিকা আমূল গাঁথা যাদুকরের হৎপিণ্ডে।

আমরা আবার ময়লা হয়ে উঠলাম, আমাদের ঘরবাড়িগুলো হয়ে উঠলো রোগা শালিখের মতো; শস্যের কণায় আবার পচন ধরলো। আমাদের ছোটো দেশটিকে আবার মনে হ'তে লাগলো দোমড়ানো বুটের মতো। স্বপ্ন দেখা ভুলে গেলাম আমরা। আমরা বেঁচে রইলাম, তবুও বেঁচে রইলাম না; আমরা ম'রে যাই নি, তবুও আমরা বেঁচে নেই। ঘরের দিকে ফিরতে আর আমাদের সুখ লাগে না; শিশুদের চিবুক ধ'রে আদর করতে আমাদের সুখ লাগে না; নারীদের কাছে টানি না, তাদের বুকে মুখ রাখতে আমাদের সুখ লাগে না। আমরা আবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলাম একই কথা। কারো সাথে দেখা হ'লেই বলতে লাগলাম, ‘নদী শুকিয়ে যাচ্ছে’, ‘আকাশে বাঁশি বাজে না’ ‘বহু দিন মেলায় যাই নি’ ‘পুরুরে কি আবার মাছ দেখা দেবে?’ যাদুকরের কথা, খুবই গোপনে, বলতো কেউ কেউ তার কথা মনে হ'লে তার বুকে-গেঁথে-থাকা ছুরিকাটিকে মনে পড়তো আমাদের। কোথা থেকে এসেছিলো সেই যাদুকর, যে আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো? স্বপ্নের মতো সত্য আর সত্যের মতো স্বপ্ন দেখানোর জন্যে সে আবার কবে আসবে?

জঙ্গল, অথবা লাখ লাখ ছুরিকা



সচিত্রকরণ অশোক কর্মকার

জন্মের পর চারপাশের সব কিছুই আমার ভালো লেগেছিলো। মায়ের মুখ, ধাইয়ের
ভাঙা গাল, বওনের ঘ্রাণ, আমের চলায় লাল আগুনের শিখা ও ধোঁয়ার ঘোলাটে
গন্ধ আমার খারাপ লাগে নি, যেমন আজো খারাপ লাগে না। খুব ছোটোবেলার

কথাও আমার বেশ মনে পড়ে, মনে পড়লেই ভালো লাগার কথাই বেশি মনে পড়ে, এবং ভালো লাগার কথা মনে পড়লেই আমার ভালো লাগে। যে-ভিত্তিরিটি ময়লা টুপি প'রে লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের বাকিবেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতো, উঠোনে খুব দাঁড়িয়ে হাঁটতো, আমি জানতাম সে খোঁড়া নয়, তাকে আমি আমাদের ইঙ্গুলের সড়কে দৌড়োতে দেখেছি, তাকেও আমার খুব ভালো লাগতো; ভালো লাগতো বেগুনডালের টুনটুনি দুটিকে; যে-গরুটি মাঠে গিয়ে আর ফিরে আসতে চাইতো না, সেটিকে ভালো লাগতো; আমাদের পাশের বাড়ির www.boighar.com নতুন বউটি, যে গোশল করতে ঘাটে যাওয়ার সময় আমাকেও নিয়ে যেতো, আমাকে ঘ'ষে ঘ'ষে গোশল করিয়ে দিতো, যে আমাকে লাগিয়ে দিতে বলতো তার ব্লাউজের টিপবোতাম, তার বুক অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতে আমার ভালো লাগতো। আমি যে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতাম এটাও তার ভালো লাগতো, এবং তাকে আমার তখন সবচেয়ে ভালো লাগতো। জঙ্গল সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। রাঢ়িখালে জঙ্গল কেনো গাছপালাও বেশি ছিলো না; তবু ছোটোবেলা থেকেই আমার মনে জঙ্গল সম্পর্কে একটা ভয় জন্ম নেয়। মায়ের কাছে জঙ্গলের রূপকথা শোনার ফলেই হয়তো এমন হয়; ওই সব ঝুপকথায় জঙ্গলের কথা খুব থাকতো, এবং জঙ্গল থাকলেই থাকতো রাক্ষস, আর নানা রকম ভয়ঙ্কর জন্ম। তাদের কারো ছিলো দীর্ঘ ধারালো দাঁত, কারো হিংস্র নখর; তাদের কাজ নির্বিচারে অন্যকে আক্রমণ করা, অন্যের রক্ত খাওয়া। জঙ্গলের কথা মনে হ'লেই দেখতে পেতাম রাক্ষস ছুটে আসছে, তার দাঁতে ঝুলছে কোনো নিরাহ মানুষ; সাপ ছোবল দিছে, বাঘ লাফিয়ে পড়ছে হরিণের ওপর, ঘোঁ ঘোঁ ক'রে ছুটে আসছে শুয়োর, হায়েনা চিংকার করছে। জঙ্গলের সমস্ত জানোয়ারের নাম আমি জানতাম না, আজো জানি না; কিন্তু জঙ্গল আমার কাছে জানোয়ারের রাজ্য। ছেলেবেলায়ই ঠিক করেছিলাম আমি কখনো জঙ্গলে যাবো না।

কিন্তু ছোটোবেলায়ই একদিন দেখতে পাই যে আমি জঙ্গলেই বাস করছি; আমাকে, এবং আমাদের, ঘিরে আছে একটি বড়ো জঙ্গল; তাতে উদ্যত হয়ে আছে জংলি পশুদের থেকেও অনেক হিংস্র অসংখ্য পশুর নখ আর দাঁত। এটা আমি প্রথম টের পাই আমাদের ঘরেই। বাবা কখনো আমাকে কোলে নেন নি; এমনকি আমাদের যে-খুব মিষ্টি একটি ছোটো বোন ছিলো, তাকেও বাবা কখনো কোলে নেন নি; তার মুখের দিকেও একবারও মুঞ্চ হয়ে তাকান নি। তবে বাবা যে খুব নিষ্ঠুর মানুষ ছিলেন, তা নয়; কিন্তু তার মুখেই আমি প্রথম একটা জানোয়ার দেখতে পাই। আমি সুবোধই ছিলাম, এজন্যে আমার কিছুটা আদর প্রাপ্য ছিলো; কিন্তু সেটা আমি বাবার কাছ থেকে পাই নি। বাবার কোলে ওঠার অনেক ইচ্ছে হয়েছে আমার, কিন্তু তা কখনো মেটে নি। বাবা একবার আমাকে ঘরে টাঙ্গানো

তার জামার পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা আনতে বলেন; আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে সেটি নিয়ে আসি, কিন্তু প্যাকেটটা বাবার হাতে দিতে গিয়ে পা পিছলে পড়ি। আমি ভেবেছিলাম বাবা আমাকে আদর ক'রে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, কিন্তু বাবা আমার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় করিয়ে দেন। তখনই আমি আমার চারপাশে প্রথম একটা বিশাল জঙ্গল দেখতে পাই, আমার সামনে দেখতে পাই একটা রাঙ্গা। এরপর মাঝেমাঝেই বাবার মুখে আমি কেনো-না-কেনো পশুর মুখ দেখতে পেতাম। মাও ছিলেন একটা চমৎকার নিরীহ কেই কেই করা পশুর মতো। বাবা যখন ছোটো বেনচিকে, বা মাকেই মারতেন, তখন মা আমাদের জড়িয়ে ধ'রে কেই কেই করতেন; আমার মনে হতো জঙ্গলে একটা বড়ো পশুর মখোমুখি একটা অসহায় পশুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'সে আছি আমরা কয়েকটি পশুর বাঢ়া।

বাড়ির বাইরে জন্মুর মুখোমুখি হ'তে আমার দেরি হয় নি। আমাদের ধাম ভ'রেই ছিলো পুকুর, পুকুরে ছিলো আমাদের স্বপ্নের মতো নানা রকম মাছ। কেউ একটা নলা, বা বোয়াল, বা কালিবাউশ ধরতে পারলে খুব আনন্দের চিঙ্কার শোনা যেতো। আমি কখনো মাছ ধরতে যাই নি, মাছ ধরার কাজ ছিলো আমাদের চাকরটির। কিন্তু মনে মনে আমার মাছ ধরার সাধ হতো, এবং আমার সাধের কথা জেনেই হয়তো একবার একটি মাছ আমার সামনে লাফিয়ে ওঠে। কার্তিক মাসে তখন পানি ক'মে সড়ক জেগে উঠেছে; আমি সড়ক দিয়ে বইশ্বেট হাতে নিয়ে ইঙ্গুলে যাচ্ছি; এমন সময় আমার সামনে সড়কে একটা ঝই লাফিয়ে ওঠে। সড়কটি পাশে বেশি ছিলো না, আরেকটি লাফ দিতে পারলেই ঝইটি ওপাশের পানিতে গিয়ে পড়তো; কিন্তু আমি ঝইটি দেখেই আমার স্বপ্নকে দেখতে পাই, বইশ্বেট ছুড়ে ফেলে মাছটিকে জড়িয়ে ধরি। ওই বয়সে মাছটিকে জড়িয়ে ধরা আমার জন্যে সহজ কাজ ছিলো না, ওর শক্তি আমার চেয়ে কম ছিলো না; কিন্তু আমি বারবার জড়িয়ে ধ'রে ওটিকে নিষ্ঠেজ ক'রে দিই। মাছটি হয় আমার। কিন্তু যেই আমি মাছটি জড়িয়ে ধ'রে বাড়ির দিকে পা বাড়াই, আমার সামনে একটি জানোয়ার এসে উপস্থিত হয়। পশ্চিম পাড়ার তোতা মিয়া, যাকে দেখলে আগে থেকেই আমার চোখে শুয়োর শুয়োর ধরনের একটা জন্মুর মুখ ভাসতো, সে আমার বুক থেকে মাছটি কেড়ে নেয়। ‘অই, তুই মাছ ধরলি ক্যান’ ব'লে সে আমাকে ধমক দেয়; যেনো আমি তার নিজের মাছটি ধরেছি। সে মাছটির কানশা ধ'রে তার বাড়ির দিকে চ'লে যায়। আমি অনেকক্ষণ ধ'রে একটা বিশাল জঙ্গলে প'ড়ে থাকি, একটা প্রকাণ শুয়োরের ঘোঁঁ ঘোঁঁ শব্দ শুনতে থাকি; আমাকে ঘিরে একটা বিশাল জঙ্গলব্যাপী শুয়োরের অস্তহীন ঘোঁঁ ঘোঁঁ শব্দ উঠতে থাকে।

যতোই বড়ো হ'তে থাকি ততোই আমি নানা চেহারা, নখ, আর দাঁতের

জন্মদের মুখোমুখি হ'তে থাকি; বুঝতে পারি আসলে আমি জঙ্গলেই রয়েছি। জঙ্গলে যাবো না ব'লে আমি স্থির করলেও জঙ্গলই এসে আমাকে, ও আমাদের, ধিরে ফেলে। একবার এক স্যার অকারণে আমাকে বেত মেরেছিলেন, আমার কোনো দোষ ছিলো না; স্যার চেয়ারে ব'সে বিমোতে শুরু করলে কুকুরও কু ব'লে ডেকে উঠেছিলো রহমান; কিন্তু স্যার চেয়ার থেকে ছুটে এসে আমাকে বেত মারতে শুরু করেন। আমি তার মুখে একটা ছোটো পশুর মুখ দেখতে পাই; একটা জঙ্গল জেগে ওঠে ক্লাশ জুড়ে। একবার লঞ্চে ক'রে আপাকে দেখতে যাচ্ছিলাম, আমি অনেক আগে গিয়ে কেবিনে বসেছি যাতে ব'সে যেতে পারি; লঞ্চ ছাড়ার ঠিক আগে কেবিনে একটা দারোগা ঢোকে, ঢুকেই আমাকে ধমক দিয়ে টেনে উঠিয়ে নিজে ব'সে পড়ে। আমি একটা প্রকাণ্ড শুয়োরের মুখোমুখি কাঁপতে থাকি, ওর নখ আর দাঁত দেখে দৌড়ে বাইরে যাই; মনে হয় আরেকটুকু সেখানে থাকলে শুয়োরটি আমার ভেতরে তার নখ ঢুকিয়ে দেবে। আমি একটি জঙ্গলে পরিবৃত হয়ে পড়ি। লঞ্চটিকে আমার শ্বাপন সরীপ্তপূর্ণ একটি ঘন জঙ্গল ব'লে মনে হয়; ইচ্ছে হয় নদীতে লাফিয়ে প'ড়ে নিজেকে বাঁচাই। আমাদের বিলের ভিটেয়ে সেবার একটি বড়ো লাউ ধরেছিলো, আমিই ওই গাছটির বীজ বুনেছিলাম ব'লে লাউটির জন্যে আমার খুব মায়া লেগে গিয়েছিলো; এমনকি বাবাও মাঝেমাঝে লাউটি অন্যদের দেখিয়ে আমার প্রশংসা ক'রে বলতেন যে গাছটি আমি লাগিয়েছি। বাবা যখন কাউকে একথা বলতেন, আমার শুনতে খুব ভালো ও খুব লজ্জা লাগতো; বাবাকে আমার তখন অত্যন্ত সুন্দর মনে হতো। সম্ভবত দেবতারা অমন সুন্দর হয়ে থাকে। বাবার মুখে যে আমি পশুর মুখ দেখেছিলাম, তা আমি তখন ভুলে যেতাম। আমি মাঝেমাঝেই ভিটেয়ে গিয়ে লাউটি দেখতাম। একদিন দেখি পাশের ভিটের লোকটি আমার লাউটি ছিঁড়ে নিচ্ছে; আমি চিৎকার ক'রে উঠতেই সে তার হাতের কাস্টেটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারে। তার মুখে আমি একটা বাধ দেখতে পাই, সারা আড়িয়ল বিল আমার চোখের সামনে একটা জঙ্গল হয়ে ওঠে; আমার দিকে কাস্টের মতো নখর এগিয়ে আসতে থাকে।

শুধু যে আমার দিকেই জন্মুরা নখর উদ্যত করতো, তা নয়; আমি দেখেছি চারদিকেই জন্মুরা নখর বাড়াচ্ছে, দাঁতে অন্যের মাংস ছিঁড়ে ফেলছে, অন্যের মাংসে পুষ্ট হয়ে উঠছে। জন্মুরা যে শুধু পেট ভরানোর জন্যেই থাবা দিতো, তা নয়; তারা যে থাবা দিতে পারে, থাবা দেয়ার জন্যেই যে তারা জন্মেছে, তাদের থাবা সহ্য করার জন্যেই যে অন্যদের জন্য হয়েছে, এটা দেখানোর জন্যও তারা থাবা দিতো, যখনতখন থাবা দিতো। থাবা দেয়া তাদের গৌরব। আমার মামা অমন এক জন্মু ছিলেন। মামা জন্মু হিশেবে ছিলেন সিংহ, তার পাশে অন্যরা ছিলো ছোটো ছোটো জন্মু; অধিকাংশই ছিলো মেষ। মামার কাছে আমি বিশেষ যাই নি;

যদিও মামা আমাকে দেখলেই দেবতা হয়ে উঠতেন, খুব আদর ক'রে কাছে ডাকতেন; আমি যে সব পরীক্ষায় প্রথম হই, যদিও আমি সব পরীক্ষায় প্রথম হই নি, তা ওদের জানিয়ে দিতেন; ওরা লেজ নেড়ে নেড়ে মামার কথায় মাথা নাড়তো। একদিন আমি মামার বাংলাঘরে উকি দিতেই দেখি মামা চেয়ার থেকে উঠে এসে মাটিতে কাতর ভঙ্গিতে ব'সে থাকা লোকটিকে লাথি মারছেন। ওই লোকটি তার সামনে তখন কোনো জন্ম দেখতে পায় নি, সে একজন মান্যগণ্য লোকই দেখতে পেয়েছে; কিন্তু আমি দেখতে পাই যে মামার দাঁত বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে, তার তার মাথায় কেশের উচু হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে তিনি সিংহ হয়ে উঠেছেন। আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষককে একবার থামের লোক প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিলো, থামের মানুষ ভালোবেসে একটি মানুষকে জানোয়ার ক'রে তুলেছিলো। তিনি ছিলেন আমাদের সবচেয়ে ভালো স্যার, মানুষও ছিলেন সবচেয়ে ভালো; কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমি দেখতে পাই আমাদের ওই স্যার আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড়ো জানোয়ার হয়ে উঠেছে। একটি ছোট ঘটনায়ই আমি তা টের পাই। স্যারের বাসায় আমি প্রাইভেট পড়তে যেতাম, আগে আমাকে যত্নের সাথে পড়াতেন; কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই বলতেন, ‘কাল আসিস।’ তখন তার মুখে একটা পশ পশ ভাব জেগে উঠতো। একদিন একটি গরিব লোক তার কাছে রেশন কার্ডের জন্যে কাকুতিমিনতি করতে এলে তিনি চেয়ারে ব'সেই লোকটির মুখে লাথি মারেন। লোকটি উল্টে নিচে প'ড়ে যায় ব'লে সে কোনো জানোয়ার দেখতে পায় নি; কিন্তু আমি আমার মুখোমুখি একটি জন্মকে দেখতে পাই। দেখি চারদিক ঘন জঙ্গলে ছেয়ে গেছে, একটি জন্মুর সামনে আমি ব'সে আছি, জন্মুটি আমাকে জ্যামিতি পড়াছে।

একের পর এক জন্মুর মুখোমুখি হ'তে হ'তে এক সময় আমি অনুভব করি যে আমার ভেতরে কী যেনো ঘটছে, মনে হ'তে থাকে আমার ভেতরে শক্ত লোহা জন্ম নিচ্ছে; আমার ভেতরে একটি লোহার খনি গ'ড়ে উঠেছে। আগে জন্মুর মুখোমুখি আমি লাউডগার মতো নরম হয়ে উঠতাম, কিন্তু নবম শ্রেণীতে ওঠার পর বোধ করি আমার রক্তে শক্ত ধারালো কী যেনো বইতে শুরু করেছে।
 রক্তনালিতে তরল রক্তের বদলে শক্ত ধারালো বস্তুর প্রবাহে আমি উল্লাস বোধ করি, বুঝতে পারি এ-জঙ্গলে বেঁচে থাকার জন্যে আমার ভেতরে কিছু একটা সৃষ্টি হয়ে চলছে। তখন থেকে আমার তয় কমতে থাকে, রক্ত আগে যেমন সহজেই কাঁপতে শুরু করতো, তার সে-কম্পন ক'মে তা শক্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; কিন্তু আমি তখনো জানি নি আমার ভেতরে কী জন্ম নিচ্ছে। একবার বাজারে একটা লোক খামোখাই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আগে হ'লে আমি চুপ ক'রে উঠে আমার কাপড় পরিষ্কার করতাম, তারপর মাথা নিচু ক'রে মায়ের জন্যে

পেঁয়াজরসুন কিনতাম; কিন্তু সেদিন খপ ক'রে আমি তার লুঙ্গিটা ধ'রে ফেলি, তার দিকে স্থির চোখে তাকাই। লোকটি আমার চোখে কী যেনো দেখতে পায়। সে কি দেখতে পায় যে আমার চোখে ঝকঝক ক'রে উঠেছে বাশিরাশি ছুরিকা? আগে হ'লে লোকটি আমাকে আরেকটি ধাক্কা দিয়ে চ'লে যেতো; কিন্তু এবার সে আমাকে টেনে তোলে, আমার হাত ধ'রে মাফ চায়। সে মাফ চাওয়ার সময় বারবার আমার চোখের দিকে তাকায়; সেখানে সে নিশ্চয়ই একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছিলো; কিন্তু আমি দেখতে পাই নি, যেহেতু নিজের চোখ নিজে দেখা যায় না।

তবে তারপর আমি বুঝতে পারি আমার রক্তে ছুরিকা বয়ে চলেছে, এ-জঙ্গলে বেঁচে থাকার জন্যে যা খুব দরকার। তারপর যখনি কোনো পশু আমাকে আক্রমণ করেছে, বা করতে উদ্যত হয়েছে, তখনি আমার আঙুল, মুঠো, বাহু, চোখ থেকে একের পর এক, লাখ লাখ, ছুরিকা বেরিয়ে আসতে থাকে; আলোতে ও অঙ্কারে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিতে থাকে। ছুরিকার মুখোমুখি কোনো জন্তু দাঁড়াতে পারে না। ওই ছুরিকা আমার খুব বেশি ব্যবহার করতে হয় নি আমার উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত, কেননা তখনো আমি খুব ভয়ঙ্কর জন্তুর মুখোমুখি বিশেষ পড়ি নি। আমার প্রায় সমস্ত ছুরিকার প্রয়োগ দরকার হয়ে পড়ে যখন আমি বিশ বছরে পড়েছি, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। তখন একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়, যার পাশে এলে আমার সমস্ত অস্তিত্ব টলমল করতে থাকতো; আমি আমার নিশ্চাসের চেয়েও কোমল হয়ে উঠতাম। সে এতো সুন্দর ছিলো যে আমি তাকে ছুঁতেও ভয় পেতাম, পাছে সে আমার ছৌঁয়ায় ময়লা হয়ে ওঠে। আমি ছেলেবেলায় যেমন ঝকঝকে পেতলের প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, ময়লা হয়ে যাবে তেবে ছুঁতাম না; একবার খুব লোভে প'ড়ে ছুঁতেই প্লেটটি ময়লা হয়ে যায়; তেমনি ময়লা হওয়ার ভয়ে তাকেও ছুঁতাম না, যদিও সে আমার হাত ধ'রে ব'সে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করতো। একবার তারই কথায় আমি তাকে নিয়ে শহর থেকে দূরে যেতে রাজি হই; আমরা শহরের একথানে একটি উদ্যানে যাই। সেটা উদ্যান ছিলো, জঙ্গল ছিলো না; কিন্তু সেখানেই আমার জীবনের প্রথম বড়ো জঙ্গলটি দেখা দেয়। অতো সুন্দর উদ্যানে আমি আগে কখনো যাই নি, অতো সুন্দর উদ্যানে অতো সুন্দরের হাত ধ'রে অতো সুন্দরের পাশে আমি কখনো বসি নি। তার মুঠোতে যখন আমি উদ্যানের সবচেয়ে কোমল ফুলটির থেকেও বেশি কাঁপছিলাম, তখন জন্তুরা দেখা দেয়। দুটি জন্তু এসে দাঁত নখর বের ক'রে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; একটি আমার দিকে নখর বাড়িয়ে দেয়, আরেকটি তার দিকে থাবা দেয়। আমি দেখতে পাই উদ্যানটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে, দুটি শুয়োর আক্রমণ করেছে আমাদের; একটি ময়লা করতে উদ্যত হয়েছে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকে। তখন আমার ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে বোঁবাখে
আসতে শুরু করে লাখ লাখ ছুরিকা। প্রথমে আমার রক্ত ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ ও
ধারালো হয়ে ওঠে, সে-ইস্পাত ছুরিকা হয়ে আমার বাহ্তে, মুঠোয়, চোখে,
মুখে ঝকমক ক'রে ওঠে। আমি ছুরিকা চালাতে থাকি, একের পর এক ছুরিকা
চালাতে থাকি;—শতো শতো, হাজার হাজার, লাখ লাখ ছুরিকা চালাতে থাকি।
ছুরিকার আক্রমণে জন্মুরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; একটি জন্মু রক্তাক্ত পালিয়ে যায়,
আরেকটিকে আমি ছুরিকায় ছিঁড়েফেড়ে ফেলি। ওই জঙ্গলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ
সৌন্দর্যের পায়ের নিচে আমি একটি রক্তাক্ত মৃত জন্মুকে বিছিয়ে দিই। সৌন্দর্য
আমাকে জড়িয়ে ধ'রে টেলমল করতে থাকে। জঙ্গলে সৌন্দর্যকে অম্বান রাখতে
হ'লে ছুরিকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই ব'লে আমার মনে হয়।

এরপর ছুরিকা চালাতে আমি আর দ্বিধা করি নি। আমি যে জঙ্গলে বাস করি,
আমাকে ও আমার মতো অন্যদের যে ঘিরে আছে বিচ্ছিন্ন ধরনের পশ্চ, তা আমি
কখনো ভুলি নি; এবং যখনি দরকার হয়েছে তখনি আমার চোখমুখমুঠোতে
ঝকমক ক'রে উঠেছে লাখ লাখ ছুরিকা। জন্মু, সেটি যতো হিংস্র বা বলবানই
হোক, ছুরিকার মুখোমুখি খুব অসহায় বোধ করে; ওরা থাবা দেয় মেষ বা ছোটো
জন্মুদের শরীরে। আমি প্রথমে যে-অফিসে কাজ নিয়েছিলাম, তার প্রধানটি ছিলো
একটা বড়ো মোটা জন্মু; প্রতিদিনই সে কারো না কারো মাংস খেতো। তার দাঁতে
সব সময় রক্ত লেগে থাকতো। আমি নতুন যোগ দেয়ার পর আমার মাংস খাওয়ার
জন্যেও একদিন সে দাঁত বাড়ায়; বাড়িয়েই দেখে সে কয়েক হাজার ছুরিকার
মুখোমুখি প'ড়ে গেছে, আর অমনি জন্মুটি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খুব সুন্দর একটা
দেবতা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আমি তার টেবিলে একটি ছুরিকা গেঁথে রেখে
বেরিয়ে আসি, এবং এরপর যতোবারই আমি তার কক্ষে গেছি, দেখেছি ছুরিকাটি
তার টেবিলে গেঁথে আছে, জন্মুটি আমাকে দেখে খুব দেবতা দেবতা ভাব করছে,
যদিও আমি দেখতে পেয়েছি কোনো মেষের কাঁচা মাংস লেগে আছে তার দাঁতে।

আজকাল অনেক জন্মুর সাথেই আমার সম্পর্ক; প্রতিটিই আমার দিকে নখর
বাড়িয়েছিলো, কিন্তু ঝলসানো ছুরিকা দেখে নখ আর দাঁত ফিরিয়ে নিয়ে ভেতরে
ভেতরে ভীষণ পুড়ছে। মাঝশহরের জঙ্গলের একটি প্রকাণ্ড জন্মু একবার নখর
বাড়িয়েছিলো, এখন নখরহীন হয়ে প'ড়ে আছে; খুব দয়ালু দয়ালু ভঙ্গিতে এখন
সে বিচরণ করে। এ-জঙ্গলের এক পাশে একটা ছোট ঝোপে থাকে একটা ছোটো
জন্মু; শুয়োরের ওরমে শেয়ালির গর্ভে হয়তো ওটা জন্ম নিয়েছিলো। সেটাও না
বুঝে একবার থাবা দিয়েছিলো; কিন্তু থাবাটি আর ফেরত নিতে পারে নি; এখন
খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে; খুব বিনয়ী ভঙ্গিতে হাঁটে।

এ-জঙ্গলে জন্মুর দাঁত আর নখর দেখলেই আমার দু-হাতের আঙুল থেকে
বেরিয়ে আসে লাখ লাখ ছুরিকা। জঙ্গলে ছুরিকা ছাড়া চলে না।

আমাৰ কুকুৱগলো

www.boighar.com



সচিত্রকৰণ নাজিৰ তাৰেক

এ-মহানগৰীতে এখন আমাৰ একপাল কুকুৱ আছে। মা বলতো পুৱষ্য কুভাৰ মতো, ওই কুভাগলো থেকে দূৰে থাকবি। আমি—মায়েৰ কথামতো নয়, আমাৰ মতো ক'রেই—ওদেৱ থেকে দূৰেই থেকেছি; কিন্তু দূৰে থাকা অসম্ভব। ওৱাই দখল

ক'রে আছে চারপাশ-পৃথিবী আর মহাজগৎ; তাই ওদের কাছে যেতেই হয়, না গিয়ে বাঁচা যায় না। কুকুরের মধ্যে বাস ক'রে কুকুর থেকে দূরে থাকা যায় না। তবে জন্মেই ওদের আমি কুকুর মনে করি নি, মানুষই মনে করেছি; আমার মতোই মানুষ, একটু অন্য রকম মানুষ, ভিন্ন রকম শরীরের মানুষ; কিন্তু দিন দিন দেখেছি মায়ের কথাই ঠিক। মা আমার থেকে অভিজ্ঞ বুঝতে পারি। ছোটোবেলা থেকে আমি দূরেই থেকেছি সবার থেকে; এমনকি বাসায়ও থেকেছি অনেকটা একলা; ইঙ্গুলেও মিশেছি দু-একজনের সাথে। পুরুষ আমি দেখেছি দূর থেকেই, দেখতে আমার খারাপ লাগে নি;—পুরুষ দেখতে গওয়া বা ভালুকের মতো নয় যে দেখেই খারাপ লাগবে; আবার হরিণের মতো নয় যে দেখেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করবে। বাল্যকালে আমার বয়সের দু-একটি বালক দু-একবার আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকানোর চেষ্টা করেছে; ওদের পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে দেখেছি, দেখে ভালোই লেগেছে; কিন্তু আমি আমার পায়ের নিচে কোনো কম্পন বোধ করি নি।

বালকেরা কুকুর নয়; ওরা খরগোশ বা বেড়াল। একটি বালকের সাথে, যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি, বেশ দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বালকটি বলেছিলো আর আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম; খুব দূরে যেতে আমার সব সময়ই সাধ হয়। তবে ওই বালকটি দূরে যেতে চায় নি, চেয়েছিলো আমার কাছে আসতে। আমরা একটি গাছপালাভরা উদ্যানে গিয়েছিলাম, যার পাশেই ছিলো বড়ো একটি দিঘি—এজনে বালকটিকে আমি মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। আমি গাছপালা দিঘি দেখেছিলাম, সবুজ হয়ে উঠেছিলাম, চেউ হয়ে উঠেছিলাম; আর বালকটি সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে খরগোশের মতো চঞ্চলতা করছিলো। সে গাছপালা দেখে নি দিঘি ও দেখে নি। ওকে আমার খরগোশ মনে হচ্ছিলো বেড়াল মনে হচ্ছিলো। কিন্তু এখন www.boighar.com সে একটি আন্ত কুকুর হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। দেড় যুগ ধ'রে তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই; অনেক আগেই সে বিয়ে ক'রে দু-তিনটি বালকবালিকা জন্ম দিয়ে মানবজাতিকে বিকশিত করেছে, এবং মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মানবসৃষ্টিতে আর সুখ পাচ্ছে না। আমাকে সে এখন খুলনা না যশোর না চট্টগ্রাম থেকে যেনো টেলিফোন করে—জানি না কীভাবে আমার নম্বর সংগ্রহ করেছে; টেলিফোনে আমি তার লকলকে জিভের শব্দ, লালার গলগল আওয়াজ শুনতে পাই। খরগোশটি এখন একটা সম্পূর্ণ কুকুর হয়ে উঠেছে; মা হ'লে বলতো কুস্তা হয়ে উঠেছে।

কলেজে পড়ার সময় আমার প্রথম কুকুরটি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। কুকুরটি ছিলো আম্বাৰ সহকৰ্মী বন্ধু, যাকে আমি চাচা বলতাম, বেশ শ্রদ্ধা করতাম। আমার কুকুরগুলোকে, কুকুর হয়ে ওঠার আগে, আমি বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করেছি; তিনি

আপনি বলেছি; এখন সে ছাড়া কোনো সর্বনাম মনে আসছে না। সে আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছিলো, আমাকে দেখলেই মাথায় হাত রেখে মেহ প্রকাশ করতো, যেমন আব্দা আমার মাথায় হাত রেখে আদর করতো। তার হাত আমার মাথায় অনেকক্ষণ থাকতো; আমার খারাপ লাগতো না, ভালোও লাগতো না। সেদিন বাড়িতে একটা উৎসব ছিলো—ছোটো বোনের জন্মদিন; চাচাটি বড়ো একটি উপহার নিয়ে এসেছিলো বোনটির জন্যে। উৎসব যখন পুরোদমে চলছে, সবাই আনন্দে উঠেল, আমি আমার ঘরে চ'লে যাই; গিয়ে একটি বই খুলে পড়তে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখি চাচাটি আমার ঘরে ঢুকছে। তাকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে সালাম দিই, সে আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহ প্রকাশ করতে থাকে; পকেট থেকে আমাকে একটি উপহার বের ক'রে দেয়। খুশিতে উপহারের ছোট বাঙ্গটি যখন খুলছিলাম, তখন চাচাটি আমাকে জড়িয়ে ধরে; আমি চমকে উঠি, এবং টেনে আমার বুক থেকে তার ডান হাতের থাবাটি সরিয়ে দিই।

‘আমি চিন্কার করবো’ আমি বলি।

‘না, মা, চিন্কার কোরো না’ সে তার আঞ্চলিক বাঙ্গায় বলে, ‘তাহলে আমার মানসম্মান থাকবে না।’ দু-হাত জোড় ক'রে কুকুরটি কাঁপতে কাঁপতে আমার পায়ের কাছে ব'সে পড়ে।

আমি আমার পায়ের কাছে একটা বুড়ো হাবড়া কুকুরকে ব'সে থাকতে দেখে ঘেন্না বোধ করি। একটু আগেই তার জিভ লকলক করছিলো, এখন দেখি তার দাঁত নেই।

‘কুকুরের আবার মানসম্মান কী’ আমি বলি।

www.boighar.com

আমি চিন্কার করি না; সে আমার পায়ের কাছে থেকে উঠে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর আমি কুকুর থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করেছি। আমি বাস করতাম আমার পৃথিবীতে, বাইরের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিলো না, তাই কুকুরদের খুব কাছাকাছি আমাকে অনেক বছর আসতে হয় নি। যখন আমি বিকশা ক'রে কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম, আমি দু-পাশের দিকে তাকাতামই না; মনে হতো তাকালেই পথেপথে কুকুর দেখতে পাবো। তার চেয়ে অন্ধের মতো চ'লে যাওয়াই ভালো। যখনই চোখ খুলে দু-পাশে তাকিয়েছি পথের পাশে একটি-দুটি কুকুর দেখতে পেয়েছি, লালা ঝরতে দেখেছি। কুকুরের লালার কোনো শেষ নেই। তবে ওগুলো থেকে আমি দূরে ছিলাম। কলাভবনে একবার একটি বুড়ো কুকুর তার ঘরে আমাকে ডেকে নেয়। বুঝতে পারছিলাম অনেক দিন ধ'রেই সে আমাকে মনে মনে চাটছে, চাটছে আরো অনেককে, কিন্তু কাছে পাচ্ছে না;

ক্লাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে আরো অনেককে চাটতো, এবং আমাকেও; কিন্তু আমি কখনো তার ঘরে যাই নি ব'লে আমাকে অস্তরঙ্গভাবে চাটতে পারছিলো না। একদিন সে বারান্দা থেকে আমাকে তার ঘরে ডেকে নেয়, আমার পক্ষে না করা সম্ভব হয় না।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে ব'সেই সে আমার ডান হাতটি দেখতে চায়। চেয়ারে আমি একটি কুকুর দেখতে পাই। সে নাকি হস্তরেখা পড়তে পারে। আমি খুব বিব্রত বোধ করি, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতটি সামান্য বাড়িয়ে দিই।

‘যতো নম্বর চাও, পাবে’ বুড়ো কুকুরটি বলে, ‘আমার ঘরে নিয়মিত আসবে।

সে আমার হাতের রেখা পড়তে থাকে, তার জিন থেকে আমার মুঠোতে লালা ঝরতে থাকে। বুড়ো কুকুর; আগের মতো দাঁত নেই, কিন্তু লালা আছে। আমি হাত টেনে নিয়ে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে আসি। বেশি নম্বর আমার দরকার ছিলো না ব'লে আমি আর তার ঘরে যাই নি; কিন্তু দূর থেকে সে আমাকে চাটতো আমি টের পেতাম। সে আমার গোশতে কামড় দিতে পারি নি ব'লে একটা জ্বালা বোধ করতো, ক্লাশে আর বারান্দায় তার চোখ দেখেই বুঝতে পারতাম। বুড়ো বাধের স্বর্ণবলয়ের মতো ওই বুড়ো কুকুরটির ছিলো একটি পুরোনো খাতা; তিরিশ বছর আগে সে ওটি পেয়েছিলো কারো থেকে। সে ওই খাতাটি দেখিয়ে ডাকতো; বলতো আর কোথাও পাবে না, এখানেই সব লেখা আছে, যদি নম্বর চাও, তবে এসো; এই খাতা থেকে নকল ক'রে নাও। যারা ধরা দিতো তারা বেশ নম্বর পেতো, বিনিময়ে সে একটু গোশত খেতো। আমি ছেঁড়া খাতার বিনিময়ে তাকে গোশত খেতে দিই নি। তাই সে দূর থেকে আমাকে চাটতো।

বেশ কয়েক বছর পর আমাকে বাইরে বেরোতে হয়; আমি আর আমার ছেটো পৃথিবীতে একান্ত একলা বাস করতে পারি না। একটু পড়াশুনো ধরেছিলাম, একে আমার খুব মহৎ কাজ মনে হয়েছিলো, এখন আমি এর অস্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারি। খুব মন দিয়ে কাজটি শেষ করতে করতে বেশ সময় চ'লে যায়; সেটি শেষ ক'রে দেখি আমার অনেক কিছু শেষ হয়ে গেছে। দেখি কোথাও চাকুরি পাচ্ছি না; আমার বয়স হয়ে গেছে, বা আমি বেশি যোগ্য, আর আমি যেখানে ঢুকতে চেয়েছিলাম, তার জন্যে আমি যোগ্য নই, কেননা সেখানে যোগ্যতার কোনো মূল্য নেই। সেখানে এতো বেশি অযোগ্য ঢুকে আছে যে সেখানে যোগ্যদের ঢোকা অসম্ভব—আমি অবশ্য অযোগ্যই। আমি একটি সামান্য কাজ নিই, লোকগুলো খুব দয়া ক'রে আমাকে কাজটি দেয়; কেননা তারা দেশের মঙ্গল চায়। আমাকে তারা বারবার মনে করিয়ে দেয় দেশের মঙ্গলের জন্যে আমাকে তারা কাজটি দিয়েছে, নইলে শক্তিশালীদের প্রার্থীকেই তারা কাজটি দিতো। আমি তাদের প্রতি খুব

কৃতজ্ঞ বোধ করি।

আমার একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে আমি বিয়ে করি নি বা আমার বিয়ে হয় নি, কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে—ওদের হিশেবে; এবং আরো ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে আমি আজো আকর্ষণীয়;—এটা মিথ্যে বা আত্মপ্রশংসা নয়। কোথাও গেলে আমাকে কেউ উপেক্ষা করে না। আমি চারদিকে সাড়া জাগিয়ে যাই না, সে-শক্তি আমার নেই; আর সাড়া জাগাতে আমার কখনো ভালোও লাগে না। একবার একটি অফিসে আমি আর আমার পিতার বয়সী একটি লোক গেছি; পরিচালকটি আমাকে একটি চেয়ারে বসানোর জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার পিতার বয়সী লোকটির দিকে তাকায়ই না। আমার পিতা এলে তাকে লোকটি এভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখতো ভেবে আমার কষ্ট হয়, আমি লোকটিকে চেয়ারে বসতে বলি; তখন পরিচালকটির ভদ্রতাবোধ আরো বেড়ে ওঠে, ওই লোকটির জন্যেও একটি চেয়ারের ব্যবস্থা করে। লোকটি আমার দিকে কর্ণভাবে তাকায়, মনে হয় সে আমাকে দোয়া করছে, যদিও দোয়ায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার পরিচয় দেয়ার পর পরিচালকটি আরো পাগল হয়ে ওঠে; আমার কাজটি করার কথা ভুলে সে আমাকে বিনোদিত করার বড়ো বড়ো পদক্ষেপ নিতে থাকে।

পরিচালকটি তার টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলে, ‘মাঝেমাঝে ফোন করবেন, খুব সুখী হবো।’

আমি বলি, ‘বাসার নম্বরটিও দিন।’

পরিচালকটি ভয়ে কেঁপে ওঠে; বলে, ‘না, না, বাসায় ফোন করবেন না।’

আমি হাসি।

সে বলে, ‘আপনার নম্বরটি দিলে আমিই ফোন করবো।’

আমি তাকে নম্বরটি দিলে সে ধন্য বোধ করে।

পরিচালকের চেয়ারে আমি একটি কুকুর দেখতে পাই। আমার একপাল কুকুরের মধ্যে পরিচালকটি অন্যতম।

www.boighar.com

কতো বয়স আমার ওই কুকুরটি? চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ? পুরুষ কুকুর হয়ে ওঠে সম্ভবত চল্লিশ পেরোনোর, বা একটি-দুটি বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর। আমার বয়সী কিছু পুরুষের সাথেও আমার দেখা হয়; ওরা ঠিক কুকুর হয়ে ওঠে নি, তবে হয়ে উঠবে, তার আভাস পাই; এখন ওরা অসহায় মানুষ। কুকুর হয় তখনি যখন পুরুষের অসহায়ত্ব কেটে যায়, যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার প্রত্যেকটি কুকুর খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওদের ঘরে ঢোকা সহজ নয়, অনেকগুলো বেড়া পেরোতে হয়; ওদের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলা যায় না, সহকারীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমাকে অবশ্য ওসব বাধা পেরোতে হয় না; আমি ফোন করলে

ଓରା ଧନ୍ୟ ବୋଧ କରେ, ଘର ଥେକେ ହ୍ୟତୋ ଲୋକଜନ ବେର କ'ରେ ଦେୟ; କିନ୍ତୁ ଆମି ସାଧାରଣତ ଫୋନ କରି ନା । ଓରାଇ କରେ । ଓରା ଓଦେର କୁଣ୍ଡିର କଥା ବଲେ ଆମାକେ, ବାରବାର ବଲେ; କୃତିତ୍ତର କଥା ବଲେ, ବାରବାର ବଲେ; ଦର୍ଶନ ଶୋନାଯ, କବିତାଓ ଆସୁନ୍ତି କରେ, ଅଧିକାଂଶଇ ଭୁଲ, ଅନେକ ଆଗେ ପଡ଼ା; ଏବଂ ଆମି ଓଦେର ଲକଳକେ ଜିଭ ଦେଖତେ ପାଇ । ଓରା କେଟେ ବାଘ ବା ସିଂହ ନୟ, ନିତାନ୍ତଇ କୁକୁର; ଗୋଷତେ ଏକଟୁ କାମଡ଼ ଦିତେ ଚାଯ, ତାଡ଼ା କରଲେ ଲେଜ ଗୁଟିଯେ ଦୌଡ଼ୋଯ । ଓରା କେନୋ କୁକୁର ହଲୋ, ମାଝେମାଝେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମାକେ ଭାବାୟ । ଓଦେର କୀସେର ଅଭାବ, ଓଦେର କୀସେର କ୍ଷୁଧା? ଓରା ସବାଇ ବେଶ ଭାଲୋ ଆଛେ; ବଉ ଆଛେ, ବାଚା ଆଛେ, ଅନେକେର ଗାଡ଼ି ଆଛେ, ବାଡ଼ିଓ ଆଛେ ଅନେକେର; କିନ୍ତୁ ଗୋଷତେ କାମଡ଼ ଦେୟାର କ୍ଷୁଧା ଓଦେର କେନୋ ମେଟେ ନି?

କ୍ଷୁଧାର ବ୍ୟାପାରଟି ଆମି ଅବଶ୍ୟ ଭାଲୋଭାବେ ବୁଝି ନା; କ୍ଷୁଧାର କାହେ ଆମି ଧରା ଦିଇ ନି, ଆବାର ନିଜେକେଓ କଥନୋ ଥୁବ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ବୋଧ କରି ନି । କୋନୋ ଏକଟି ଚମ୍ରକାର ପୁରୁଷର ସାଥେ ଥାକତେ ଆମାର ଖାରାପ ଲାଗତୋ ନା, ତାର ସାଥେ ଅନ୍ତରଞ୍ଜଭାବେ ଘୁମୋତେଓ ହ୍ୟତୋ ସୁଖଇ ଲାଗତୋ, ତବେ କ୍ଷୁଧାୟ ଆମି କାତର ନଇ । କିନ୍ତୁ ଓଇ ପୁରୁଷଗୁଲୋ ଏତୋ କାତର କେନୋ? ଓଦେର ସ୍ତ୍ରୀରା କି ଓଦେର କ୍ଷୁଧା ମେଟାତେ ପାରେ ନା? ହ'ତେ ପାରେ ଆମାକେ ଦେଖଲେଇ ଓଦେର କ୍ଷୁଧା ଜେଗେ ଓଠେ । ଓରା ହିଶେବି ମାନୁଷ, ହ୍ୟତୋ ହିଶେବ କ'ରେ କ୍ଷୁଧା ଜାଗିଯେ ତୋଲେ । ଆମି ଯେ ବିଯେ କରି ନି ଅର୍ଥଚ ଆମାର ବସ ହ୍ୟେଛେ, ଦେଖତେଓ ହ୍ୟତୋ ଓଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସ୍ତ୍ରୀର ଥେକେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏତେଇ ହ୍ୟତୋ କ୍ଷୁଧା ଓଦେର ପ୍ରବଳ ହ୍ୟେ ଓଠେ; ଏବଂ ହ୍ୟତୋ ଆରେକଟି ହିଶେବଓ ଓଦେର ଆଛେ । ହ୍ୟତୋ ଓରା ମନେ କରେ ଆମି ଯେହେତୁ ବିଯେ କରି ନି ଅର୍ଥାଏ ଆମାର ଯେହେତୁ ବିଯେ ହ୍ୟ ନି, ତାଇ ଆମି କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ଓଦେର ଡାକେ ସାଡ଼ା ଦେବୋ ସହଜେଇ; ଏବଂ ଓରା ଏକଟୁ ବିବାହବିର୍ଭୂତ ଫୁର୍ତ୍ତ କ'ରେ ନେବେ ।

ଓରା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦେ କରେ, ଆର ସ୍ତ୍ରୀକେ ଯମେର ମତୋ ଭୟ ପାୟ ।

ଏକଦିନ ଦୁପୁରେ ପରିଚାଳକଟି ଫୋନ କ'ରେ ଆମାକେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଶୋନାଯ । ତାର ଜୀବନ ଶେଷ ହ୍ୟେ ଗେଛେ ବିଯେ କ'ରେ, ବିରାଟ ଏକଟି ଭୁଲ ସେ କ'ରେ ଫେଲେଛେ; ସନ୍ଦେଶ ସେ ଆମାର ସାଥେ ଏକଟୁ ବେଡ଼ାତେ ଯେତେ ଚାଯ । ବାଲ୍ୟକାଳେ ଆମି ଏକଟି ଖରଗାଶେର ସାଥେ ବେଡ଼ାତେ ଗିଯେଛିଲାମ, ଆର ଯାଇ ନି; କୁକୁରଗୁଲୋର ସାଥେ ଯାଓଯାର କଥା ଆମି ଭାବତେଇ ପାରି ନା । ତବେ ଆମି ସରାସରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନା, ଆମାର ରୁଚିତେ ବାଧେ; ଆମି ନାନାଭାବେ ଏଡିଯେ ଯାଇ । କୁକୁରଟିର ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସେ ଆମି ଏକଟୁ କୋମଲ ହ୍ୟେ ପଡ଼େଛିଲାମ, ମନେ ହଛିଲୋ ସେ ଥୁବ କଷ୍ଟେ ଆଛେ; ମନେ ହଛିଲୋ ସେ ହ୍ୟତୋ ସାରା ବିକେଲ ଆର ସନ୍ଦେଶ ଭ'ରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଫେଲିବେ ।

କିନ୍ତୁ ବିକେଲେଇ ଦେଖି—ଛୋଟୋ ଭାଇଟିକେ ନିଯେ ଆମାକେ ଏକଟୁ ବାଜାରେ ଯେତେ ହ୍ୟେଛିଲୋ—ସ୍ତ୍ରୀକେ ନିଯେ ସେ ଏକଟି ସୋନାର ଦୋକାନେ ଢୁକଛେ । ଆମାର ମୁଖେମୁଖି

প'ড়ে সে বিব্রত হয়; আমি সালাম দিই, সে আমাকে চিনতে পারে না। তার জন্যে আমার দুঃখ হয়; রঙজর্জরিত তার থেকে তিনগুণ স্বাস্থ্যবতী স্ট্রীটিকে দেখে আমার আরো দুঃখ হয়। সঙ্গের পরই কুকুরটি আমাকে ফোন করে।

‘বাসা থেকে নিশ্চয়ই’ আমি হাসি।

‘আমি খুব দুঃখিত’ কুকুরটি বলে, ‘তখন কথা বলতে পারি নি।’

‘কুকুররা সব সময় কথা বলতে পারে না’ আমি বলি, ‘কিন্তু এখন কোথা থেকে কথা বলছেন?’

‘ক্লাব থেকে বলছি’, কুকুরটি বলে, ‘আসলে আমি কুকুরই।’

‘আপনার স্ত্রী খুব ঝুপসী’ আমি বলি, ‘ভাবীকে নিয়ে একদিন আসবেন।’

কুকুরটি কাঁদতে থাকে; আমি ফোন রেখে দিই।

তারপর ফোন বাজতে থাকে, ফোন বাজতে থাকে, ফোন বাজতে থাকে, আমি ধরি না।

একটি বুড়োর কাছে আমাকে যেতে হয়েছিলো, আমি ভাবি নি ওই বুড়োটিও কুকুর হয়ে উঠবে। মার সাথেই তার পরিচয়, মা-ই আমাকে তার কাছে পাঠায় একটি কাজের জন্যে। টেলিফোনে তার সাথে দেখা করার যখন সময় স্থির করি, তখন তাকে আমি মামা ব'লেই ডাকি; তার কঠস্বরেও একটা মেহের স্বর শুনতে পাই। তার অবসর নেয়ার আর দেরি নেই, বছরখানেকের মধ্যে অবসর নেবে; জীবনটাও পরিপূর্ণ। উত্তরায় বাড়ি; এক ছেলে আমেরিকায়, মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায়, শেষ ছেলেটি প্রকৌশলী হয়ে বেরোতে যাচ্ছে। তাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগে। খুব সার্থক মানুষ, আমার বাবা তার সিকিভাগ সার্থকও হ'তে পারে নি। বেশ মার্জিত মানুষ; গুছিয়ে কথা বলে—বাঙ্গলা বললে শুধুই বাঙ্গলা ইংরেজি বললে শুধুই ইংরেজি; অন্য কুকুরগুলোর মতো মিশ্র ইতর ভাষায় কথা বলে না। আমার কাজটি সে ক'রে দেয়।

আমি ধন্যবাদ জানানোর জন্যে ফোন করলেই সে বলে, ‘বিনিময়ে আমি কী পেতে যাচ্ছি?’

আমি মার প্রসঙ্গ তুলে বলি, ‘আপনার বোন নিশ্চয়ই আপনাকে নিম্নণ করবে।’

সে বলে, ‘তোমার কাছ থেকে কী পাবো?’

আমি বলি, ‘অনেক শুল্ক পাবেন; আপনি কাজটি ক'রে না দিলে খুব অসুবিধা হতো আমাদের।’

সে বলে, ‘দুপুরে আমার সঙ্গে খাও, সোনারগাঁয়ে খাওয়াবো।’

আমি বলি, ‘সোনারগাঁয়ে খেতে পারলে তো আমি খুবই সুখ পেতাম; নিখুঁত
বাইরের খাওয়া আমাৰ জন্যে একেবাবেই নিষেধ।’

সে বলে, ‘আমি একটি নতুন গাড়ি কিনেছি; চলো না তোমাকে ময়নামার্টি
দেখিয়ে আনি।’

আমি বলি, ‘ঠিক আছে মামা, একদিন যাবো; তার আগে একদিন বাসায়
গিয়ে মামীৰ সাথে দেখা কৰি।’

আমাৰ কথা শনে সে কাঁপতে থাকে আমি বুঝতে পাৰি; অনেককষণ কথা
বলতে পাৱে না। তাৰপৰ বলে, ‘না, না, মামীৰ সাথে দেখা কৰার দৰকার নেই;
তুমি কিন্তু কখনো বাসায় এসো না, বাসায় ফোন কোৱো না।’

আমি হাসি আৱ বলি, ‘আচ্ছা।’

বুড়ো কুকুৰটি একদিন বাসায় এসে উপস্থিত হয়, যা আমি কখনো ভাবি নি।
আমাৰ বিশ্বয় লাগে না, ঘেন্না লাগে; কিন্তু হাসি মুখে তাকে বসাব ঘৰে বসাই;
মাকে ডেকে আনি। তিনি যে-উপকাৰ আমাদেৱ কৱেছেন, তাতে আমৱা যে খুব
কৃতজ্ঞ তা সাবা পৰিবাৱেৰ সদস্যৱা তাৰ কাছে নানাভাৱে প্ৰকাশ কৰি। আমাদেৱ
পৰিবাৱেৰ কেউই অকৃতজ্ঞ নয় দেখে আমিই মুঞ্চ হই। কিন্তু তিনি সবাৱ সঙ্গ
চাছিলেন না, আমি বুঝতে পাৱছিলাম; তিনি চাছিলেন আমাৰ সঙ্গ। এক সময়
এক এক ক'ৱে উঠে যে যাব কাজে চ'লে যায়, কুকুৰটিকে নিয়ে আমি একলা
বসাব ঘৰে থাকি;—আমি উঠতে পাৰি না, কেননা আমি তাৰ কাছে গিয়েছিলাম
উপকাৰ প্ৰাৰ্থনা ক'ৱে; একমাত্ৰ আমিই ঝণী তাৰ কাছে। কুকুৰটিৰ মুখোমুখি
একলা আমাকে ব'সে থেকেই ঝণ শোধ কৰতে হবে। কুকুৰটিৰ মুখ থেকে লালা
ঝৰছে আমি দেখতে পাই। কুকুৰটি আমাৰ উন্টো দিকেৱ আসনে বসেছে, আমাৰ
থেকে প্ৰায় তিৰিশ বছৰেৰ বড়ো সে, কিন্তু আমি দেখি সে কাঁপছে, ঠোঁট চাটছে,
আমাৰ মুখেৰ দিকে তাকাচ্ছে, শৱীৱেৰ নানা দিকে তাকাচ্ছে।

সে বলে, ‘তোমাৰ একটু সঙ্গ পাওয়াৰ জন্যে এলাম।’

www.boighar.com

শনে ঘেন্না লাগে, মনে হয় একগাদা ময়লা আমাৰ শৱীৱেৰ ওপৰ কেউ ছুঁড়ে
দিলো; কিন্তু আমি ঘেন্না প্ৰকাশ কৰি না। ঘেন্না প্ৰকাশ কৰতে সব সময়ই আমাৰ
ঘেন্না লাগে।

আমি বলি, ‘আপনাৰ শৱীৱটা বোধ হয় ভালো নেই।’

সে বলে, ‘তোমাকে দেখলে আমাৰ বয়স তিৰিশ বছৰ ক'মে যায়, ইচ্ছে হয়
তিৰিশ বছৰ বয়স কমিয়ে ফেলি।’

আমি বলি, ‘এটা সুস্থতাৰ লক্ষণ নয়, মামা।’

কুকুরটি বলে, ‘তুমি আমাকে সুস্থ ক’রে তুলতে পারো।’

আমার আবার ঘেন্না লাগে; কিন্তু আমি মিঞ্চভাবে হাসি, কেননা ওটাই আমি পারি সহজাতভাবে। তবে আমার ভেতরে, আমি টের পাই, ঘেন্নাটা দলা পাকিয়ে উঠছে; মনে হয় ঘেন্নাটা বমি ক’রে দিই কুকুরটির চোখমুখ জুড়ে।

আমি তা না ক’রে শান্তভাবে বলি, ‘আমার মনে হয় আমি পারি।’

কুকুরটি আমার দিকে জিভ বের ক’রে তাকায়; জিভ থেকে লালা ঝরতে থাকে; মনে হয় এখনই আমার গোশতে কামড় দেবে।

আমি পা থেকে একটা স্যান্ডল খুলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, ‘এটা আপনি পাঁচ মিনিট চাটুন, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।’

কুকুরটি বিব্রত হয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমি আবার বলি, ‘চাটুন, সুস্থ হয়ে উঠবেন।’

কুকুরটি আমার স্যান্ডল চাটতে থাকে, লালায় স্যান্ডলটি ভিজে যায়; আমি দেখতে পাই তার মুখ ক্ষণিতে ভ’রে উঠছে, চোখ সুখে ভ’রে উঠছে, শরীর পুলকিত হয়ে উঠছে। আমি তাকে পাঁচ মিনিট চাটতে বলেছিলাম; কিন্তু সে থামে না, ছ সাত আট দশ পনেরো বিশ মিনিট চ’লে যায়, থামে না। আমি তাকে রেখে আমার ঘরে চ’লে যাই, একবার গোশল করি, একটা বইয়ের দুটি পরিচ্ছেদ পড়ি; দু-ঘণ্টা পর ফিরে এসে দেখি নিবিট মনে কুকুরটি আমার স্যান্ডল চাটছে। লালা উপচে পড়েছে চারদিকে; আর চেটে চেটে সে স্যান্ডলটি প্রায় নিঃশেষ ক’রে ফেলেছে। ওই স্যান্ডল আমার পক্ষে আর পায়ে দেয়া সম্ভব নয়। কুকুরটি আমার দিকে সুখে তাকায়, আবার স্যান্ডল চাটতে থাকে।

আমি বলি, ‘আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, আর চাটতে হবে না।’

কুকুরটি কথা বলতে পারে না, লালা-উপচানো মুখের ওপর দুটো ঘোলা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে; জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, ‘সারাজীবন ধ’রে আমি আমি এটি চাটবো।’

আমি তাকে বলি, ‘স্যান্ডলটি আপনি নিয়ে যান, সঙ্গে রাখবেন, যখন ইচ্ছে হয় চাটবেন।’

আমি তাকে আমার দুটো স্যান্ডলই দিয়ে দিই। সে তার জ্যাকেটের ভেতরে স্যান্ডল দুটি ঢুকিয়ে একটি পরিত্ত কুকুর হয়ে বেরিয়ে যায়।

আমি কি বিয়ে করবো? যেটিকে করবো সেটি কি একদিন এমন একটা কুকুর হয়ে উঠবে না? আমি একটা কুকুরের সাথে থাকবো, কুকুরের সাথে ঘুমোবো, কুকুরের ওরসে কুকুরছানা প্রসব করবো? ভাবতেই আমার সারা শরীর বমি

ক'লতে থাকে। মা অনাব হয় আমি নিয়ে ন্যায় না দেখ; তাৰা আনা
পূৰ্ণপাৰণলোকে ফিরিয়ে দিছি ব'লে মা দিন দিন বিবৃত হয়ে উঠছে; আমাৰ
ওপৰ সদেহ পোষণ কৱতে শৱ কৱছে;—ভাৰছে আমি বোধ হয় পুৱৰ্য নিয়ে
খেলছি, একটিকে নিয়ে আমাৰ সুখ নেই, আমাৰ অজস্ত দৰকাৰ; কিন্তু ম'কে
আমি বলতে পাৰি না একটি সন্তুষ্য কুকুৱকে আমি বিয়ে কৱি কীভাবে? মা
হয়তো বলবে পথে পথে কুভাৰ মুখে পড়াৰ থেকে একটা কুভাৰ মুখে পড়াই
ভালো; কিন্তু আমি তা মেনে নিতে পাৰি না। আমি কুকুৱেৰ সাথে ঘুমোতে চাই
না।

কুকুৱেৰ পৰ আমি কুকুৱেৰ মুখোমুখি হচ্ছি; আমাৰ কুকুৱপাল বাঢ়ছে। ওৱা
একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ ক'ৰে উঠলে সারা শহৰ মুখৰিত হয়ে উঠবে। কোথাও গেলেই
আমাৰ একটা-দুটো কুকুৱ বাড়ে, তাই কোথাও যেতে ইচ্ছে কৱে না। আমাৰ
একটা কুকুৱেৰ লেজ মোটা, খুব সুন্দৰভাবে লেজটি বাঁকিয়ে রাখে, লেজটিকে ওৱা
মুকুট মনে হয়; একটা কুকুৱ সব সময় দু-কান কাঁপিয়ে চলে, দেখতে অনেকটা
বিলেতি দেখায়; একটা কুকুৱ ঘেউ ঘেউ কৱতে পছন্দ কৱে, এক সময় নিশ্চয়ই
ওটা দেশেৰ মস্ত কেউ একটা হবে, ওৱা গলা জুড়ে মালা থাকবে, যেখানে যাবে
সেখানেই তোৱণ সাজানো হবে; একটা কুকুৱ স্যান্ডল চাটে, খুব বুড়ো হয়ে
গেছে; একটা কুকুৱ সারাক্ষণ কী যেনো শৌকে, ওৱা নাক সারাক্ষণ ফুলে থাকে;
একটা কুকুৱ খুব মিহি সুৱে কাঁদে, মনে হয় ওৱা কলজেটা ছিঁড়ে বেৰিয়ে আসবে;
আৱ সব কুকুৱই বিষ্টা পছন্দ কৱে। আমাৰ সবগুলো কুকুৱই দেশি, কিন্তু
প্ৰত্যেকটি বিদেশি ভাব কৱতে বেশ পছন্দ কৱে।

কুকুৱেৰ মহানগৱে একবাৱাই আমি একটি সিংহেৰ দেখা পাই; পেয়ে বিশ্বিত
হই। আমাৰ ধাৰণা ছিলো জঙ্গলে এখন একটিমাত্ৰ জন্ম রয়েছে, সেটি কুকুৱ;
আৱ কোনো জন্ম নেই—হৱিণেৱা অনেক আগেই খাদ্য হয়ে গেছে, বাঘও সব ম'ৰে
গেছে; আৱ সিংহেৰ তো কথাই ওঠে না। কিন্তু একদিন সত্যিই আমি একটি
সিংহেৰ দেখা পাই, আমাৰ জীবন ধন্য হয়ে ওঠে। আমি অনেক দিন দূৰ থেকে
তাৱ কেশৱ দেখতে থাকি, তাৱ কেশৱেৰ গৌৱৰবে আমি মুঞ্ছ হই; অনেক দিন
www.boighar.com
ধ'ৰে আমি তাৱ পদক্ষেপেৰ দিকে ভীৱৰ খৱগোশেৰ মতো তাকিয়ে থাকি, আমি
নীলিমাৰ ছোঁয়া বোধ কৱি। আমি ছোট খৱগোশ, পাতাৰ আড়ালে লুকোনো,
অৱণ্যেৰ সম্মাট আমাৰ দিকে ফিরেও তাকায় না। খৱগোশ হয়ে আমি সিংহেৰ
স্বপ্ন দেখতে থাকি। আমি বুঝি এটা আমাৰ অপৱাধ; কিন্তু ওই অপৱাধকেই
আমাৰ মনে হয় আমাৰ জীবনেৰ পবিত্ৰতম কাজ; কাৱণ সিংহেৰ স্বপ্ন আমাকে
কুকুৱেৰ সীমাৰ বাইৱে নিয়ে যায়। আমাকে মেঘেৰ স্পৰ্শ দেয়, সমুদ্ৰেৰ স্পৰ্শ
দেয়, মহান অৱণ্যেৰ অনুভূতি দেয়; আমাকে ঋপান্তৰিত ক'ৰে দেয়, আমি এক

পবিত্র সন্তায় পরিণত হই;—জন্মের আগে আমি যেমন ছিলাম। ওই স্বপ্ন আমাকে
সুন্দর ক'রে তুলতে থাকে, শুচি ক'রে তুলতে থাকে; কুকুরের সংস্পর্শে এসে
আমার মনে যতোটুকু ময়লা লেগেছিলো, তা শুভ্রতায় পরিণত হ'তে থাকে।

আমি সিংহের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করি।

কিন্তু সমর্পণ করার পরই দেখতে পাই সিংহটি কুকুর হয়ে উঠচে। তার কেশের
থ'সে পড়ে, পেশি শিথিল হয়ে পড়ে, মুখ থেকে লাল ঝরতে থাকে। একটি
কুকুরের আলিঙ্গনে প'ড়ে আছি দেখে আমি চিঢ়কার ক'রে উঠি।

আমার কুকুরপালে কুকুরের সংখ্যা একটি বাড়ে।